বিশ্বভারত

দ্বিতীয় খণ্ড

তরুণ ভারত

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব লিমিটেড্‌
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তরুণ ভারত

বিংশ শতাব্দীর নব্য-হিন্দুত্ব

বিরাট ব্যর্থতা

পাশ্চাত্য চিন্তায় অবসাদ আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তঃস্থলের একটা বিরোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। খৃষ্টান ভাবুকতার সহিত অখৃষ্টান সমাজ, সাম্যতন্ত্রের উচ্চ ভাবের সহিত সাম্রাজ্য-নীতির আদর্শ, ব্যষ্টিসর্ব্বস্ব দর্শনের সহিত বিশ্বদর্শন ইউরোপে পাশাপাশি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন মীমাংসা, কোন সামঞ্জস্য এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মে বিরোধ

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসই এই অনন্ত বিরোধের ইতিহাস। সেখানে হয় আমি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলে, না হয় বিশ্ব একরাট্ হইয়া আমিকে একবারে লুপ্ত করে। হয় আমি একরাট্, না হয় বিশ্ব একরাট্। মাঝামাঝি তার কিছু নাই। হয় আমার জন্য বিশ্ব, না হয় বিশ্বের জন্য আমি। হয় আমার জন্য এই সভ্যতা, আমারই তুষ্টিবিধানের জন্য বিশ্বসভ্যতার বিকাশ; না হয় সভ্যতার জন্য আমি, সভ্যতার বিরাট্ অনন্ত প্রবহমাণ স্রোতে আমি তৃণের মত ভাসিয়া যাই। হয় এই বিশ্বে আমি একমাত্র লীলাময়, সমগ্র বিশ্ব আমার লীলাক্ষেত্র; না হয় বিশ্বলীলার আমি ক্রীড়নক,—মহাকালের অনন্ত লীলা-স্রোতে আমি ক্ষণিকের বুদ্বুদের মত লীলা করিয়া ডুবিয়া যাইতেছি।

হয় Hedonism, না হয় Over-soul ; হয় Utilitarianism, না হয় Absolute ও Categorical Imperative ; হয় আমার জন্য flux, না হয় universal fluxএর জন্য আমি। সেখানে হয় আমি একরাট্ হইয়া বিশ্বকে কিনিব, আমার মূল্যে বিশ্ব বিকাইয়া যাইবে,—না হয় বিশ্ব একরাট্, বিশ্বের মূল্যে আমি বিকাইয়া যাইব, বিশ্বের অর্থে আমার স্বার্থ একেবারে চাপা পড়িবে। হয় সেখানে আমার স্বার্থে সমাজের দ্রব্যসামগ্রী বিকাইয়া গেল, না হয় সমাজ আমার স্বার্থকে—আমাকেই তার নিজের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া কিনিয়া লইল। হয় সেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রতা, ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা, না হয় সমাজতন্ত্র, সমাজ-সর্ব্বস্বতা। হয় সেখানে অতিমানুষের অমানুষিক প্রভাব, না হয় সাম্য-তন্ত্রে লোকসাধারণের অন্তঃসারশূন্য সমতা। হয় সেখানে প্রাণহীন সাম্যের কল্পনা, না হয় নিষ্ঠুর অসাম্যের অত্যাচার। হয় মানুষ সেখানে সংসারের মধ্যে আপনার জীবন আবদ্ধ রাখে, না হয় সংসারকে ছাড়িয়া একবারে পরোক্ষবাদকেই আশ্রয় করিয়া বসে। হয় বাস্তবকেই একমাত্র সত্য বলিয়া লোকে অবলম্বন করে, না হয় একটা বস্তুতন্ত্রহীন ভাবরাজ্যকে সার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বাস্তবকে অপমান করে।

এই অসামঞ্জস্যই হইতেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি। আর এই অসামঞ্জস্যের জন্যই ইউরোপের ভাবসমূহের সহিত ইউরোপের সমাজের অনন্ত কাল ধরিয়া বিরোধ চলিতেছে। তাই খৃষ্টান ভাবুকতা সেখানে বস্তুতন্ত্রহীন, এবং ইউরোপীয় সমাজের অভ্যন্তরে একটা খাপছাড়া জিনিষ। তাই খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টান সমাজের একটা নিষ্ঠুর বিরোধ আজ যে এই মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে ; ইউরোপীয় জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ইহা পুরাতন কথা। তাই গ্রীক-রোমীয়-টিউটন সাধনায় ও ফরাসী-বিপ্লবের ক্রমবিকাশে সাম্যতন্ত্রের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সমাজে এখনও অবলম্বিত হয় নাই। তাই সামাজিক সাম্যতন্ত্র এখনও শুধু কল্পনামাত্র রহিয়াছে, Syndicalism ও Larkinism তাহাকে

সুদূরপরাহত করিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহাকে একবারে স্বপ্নের মত উড়াইয়া দিয়াছে।

এই অসামঞ্জস্যের জন্যই ইউরোপীয় সভ্যতা এমন ফাঁকা। ইহা ঠিক সাবানের একটা প্রকাণ্ড বুদ্‌বুদের মত হাল্কি—ইহা বিপুল প্রয়াসের ফল, কিন্তু ইহার পরিণামও বিরাট্ ব্যর্থতা।

ব্যর্থতার কারণ কি ?

যে অসামঞ্জস্যের জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস একটা বিপুল প্রয়াস ও বিরাট্ ব্যর্থতার ইতিহাস, সেই অসামঞ্জস্যেরই বা কারণ কি ? এই যে আমার জন্য বিশ্ব কিংবা বিশ্বের জন্য আমি, হয় আমার কিঙ্কর বিশ্ব, না হয় বিশ্বের কিঙ্কর আমি, হয় আমার স্বার্থসাধনের জন্য সমাজ, না হয় সমাজের অর্থে আমার স্বার্থবিক্রয়, হয় ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা, না হয় সমাজ-সর্ব্বস্বতা, হয় ব্যক্তির Natural Rights, না হয় রাষ্ট্রের Divine right, হয় Carsonism, না হয় A scrap of paper, হয় আত্ম-কেন্দ্রতা, না হয় বিশ্ব কেন্দ্রতা। এই যে দুইটা বিরোধী ভাব পাশাপাশি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইতেছে না, ইহার কারণ কি ?

পাশ্চাত্য চিন্তার বিশেষত্ব—বিরোধ সৃষ্টি

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর চাহিলে বলিব, ইউরোপের জাতিসমূহের চিন্তাপদ্ধতির বিশেষত্বই ইহার কারণ। ইউরোপীয় চিন্তার বিশেষত্বই হইতেছে—সে একটা বিরোধ সৃষ্টি করিবে ; যেটাকে সে ধরিবে, সেইটাকে সে চূড়ান্ত করিয়া জগতের মধ্যে একটা খাপছাড়া জিনিস করিয়া ছাড়িবে, আর কোন দিকে সে চাহিবে না, সে চোখে ঠুলি দিয়া সোজা পথে বেগে চলিয়া যাইবে,—গণ্ডারের মত, বুনো শূয়রের মত, মটরকারের মত সে চলিবে, তাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান

একবারেই নাই। যাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, তাহার বিরোধ ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করাই একমাত্র ধর্ম্ম। ইউরোপীয় চিন্তা,—বিভাগ ও বিশ্লেষণের পক্ষপাতী,—সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য স্থাপনের পক্ষপাতী নহে,—ইউরোপায় চিন্তার ইহাই বিশেষত্ব।

হিন্দু-চিন্তার বিশেষত্ব—সমন্বয় সাধন

জাতীয় সাধনার ক্রমবিকাশফলে এক একটা বিশেষত্ব জাতিগত হইয়া পড়ে। হিন্দুর চিন্তার বিশেষত্ব হইতেছে, সে বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, অসামঞ্জস্যের ভিতর সমন্বয় আনয়ন করে। সমন্বয় সাধনেই হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দু বহুর মধ্যে এককেই অনুসন্ধান করে। শুধু তাই নহে, হিন্দু একেরই বহুরূপ দেখে। হিন্দু বলে, একমেবাদ্বিতীয়ম্। হিন্দু ইহাও বলে, যিনি এক, তিনি বহুও হ'ন। নানা বিরোধী ভাবপুঞ্জের সমন্বয়বিধানই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু সব জিনিষেরই বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া আসল সত্তাটুকু পাইতে প্রয়াস করিয়াছে। সমস্ত ছাড়িয়া হিন্দু যে সত্যের পথ ধরিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম যে বাঙালীর ধর্ম্ম বা পাঞ্জাবীর ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম যে ভারতের ধর্ম্ম বা এসিয়ার ধর্ম্ম তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। যাহার নিকট সত্য সনাতন, হিন্দুধর্ম্ম তাহারই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম আমার নহে, তোমার নহে, ভারতের নহে, এসিয়ার নহে, প্রাচ্যের নহে, পাশ্চাত্যের নহে,—হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, সর্ব্বজাতীয়। হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ব-মানবের ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম তাই কোন এক বিশিষ্ট মহাপুরুষের সাধনা হইতে জন্ম লয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মহম্মদের ধর্ম্ম বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের জীবনের সাধনার সহিত জড়িত। হিন্দু এমন কোন এক মহাপুরুষ মানে না যাঁহাকে বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি হয়। জগতে হিন্দুধর্ম্মই হইতেছে একমাত্র ধর্ম্ম, যাহার নাম কোন বিশিষ্ট মহাপুরুষের নাম হইতে হয় নাই, যাহারা হিন্দুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে

তাহাদের নাম হইতে। ধর্ম্মের জন্য আমরা নহি, আমাদের জন্য ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রকৃতিমত বিচিত্র আকার ধরিয়াছে। হিন্দুত্ব কিছুই বাদ দেয় না, পাথর পূজা হইতে ষটচক্র ভেদ সবই ইহা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও একটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলে নাই। তাই হিন্দুত্বকে বাহির হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় ইহার ভিতর কত অসামঞ্জস্য। কিন্তু একটা অসামঞ্জস্য-মূলক জিনিস লইয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখিবে বাস্তবিক ইহার ভিতর কোন বিরোধী ভাব নাই। হিন্দুর পুতুল পূজাকে খুব বিদ্রূপ কর, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু পুতুল পূজা নহে। হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের বিধিনিষেধকে কুসংস্কার বল, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু কুসংস্কার নহে। হিন্দুদর্শনের খুঁটিনাটী করিয়া দোষ বাহির কর কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু দর্শন নহে। হিন্দুর দেবদেবীর রূপবর্ণনাকে Anthropomorphism বল, দেখিবে ইহা শুধু রূপবর্ণনা নহে। হিন্দুদেবীর স্তোত্রকে তোষামোদ বল, দেখিবে ইহা শুধু স্তোত্র নহে। হিন্দুর তীর্থযাত্রাকে প্রকৃতি পূজা বল দেখিবে ইহা শুধু প্রকৃতি পূজা নহে।

হিন্দুত্বে বিরোধী ভাবের সম্মিলন

হিন্দুত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর, অত্যন্ত সরল ও ব্যাপক। হিন্দুত্বে নানা বিরোধী ভাবের মিলন। নানা ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায় হিন্দুত্বের আশ্রয় পাইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের শান্ত সুন্দর সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরস্থ দেবমন্দিরে আরতি হইতেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁক, ঢাক ঢোল সানাই সবই বাজিতেছে। পুরোহিতের হস্তে পঞ্চপ্রদীপ মন্দির আলোকিত করিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গনে পুরুষ, স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচী, মেথর ভক্তিপ্লুত চিত্তে দণ্ডায়মান। হিন্দুত্বকে সরল ও অকৃত্রিম পল্লীজীবনের এই সুন্দর দৃশ্যের

সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দুত্বের উর্দ্ধ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, অন্তররাজ্যের গূঢ় রহস্যের মধ্যে। কিন্তু ইহার মূল হইতেছে বাস্তবের অন্তরে। দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পল্লীগ্রামের অন্তঃস্থলে। হিন্দুর উপাসনা বাস্তবকে কখনই অগ্রাহ্য করে না, বাস্তবের ভিতরই হিন্দু অনন্তকে খুঁজিয়াছে। মন্দির প্রাঙ্গনের জনতার মধ্যে কেহ নাম করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ করতালি দিতেছে, কেহ বা স্থির, প্রশান্ত ধ্যানমগ্ন। হিন্দুত্ব সহজ সরল নামগান হইতে সূক্ষ্ম ও গভীর ধ্যান পর্য্যন্ত সবই বরণ করিয়াছে। গাছ ও পাথর পূজা হইতে অণোরণী-য়ান মহতো মহীয়ান পর্য্যন্ত হিন্দুত্ব সবই গ্রহণ করিয়াছে, কিছুই ত্যাগ করে নাই। শাঁক, সানাই, ঘণ্টা, স্ত্রীলোকের উলুধ্বনি সকলে মিলিয়া যেমন একটা ঐক্যতানের সৃষ্টি করে,—কিছুই বেসুরা মনে হয় না, হিন্দুত্ব নানা সম্প্রদায়ের নানাবিধ সাধনার মধ্যে সেরূপ একটা সমন্বয় স্থাপন করিয়াছে। পল্লী-মন্দিরের সেই দেবতার মত হিন্দুত্ব ভারতের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের বিচিত্র সাধনাকে একমুখী করিয়াছে,—বিরোধী ভাব-সাধনার মধ্যে শান্ত ও মঙ্গলময় একের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দুত্ব স্বাধীন ও অকৃত্রিম ভাবে শুধুই সত্যের পথ ধরিয়াছে,—সত্যের পথ কঠিন পথ, সে পথে পদে পদে বিপদ, ক্ষুরস্য ধারা মিলিতা দুরত্যয়া, কিন্তু হিন্দুত্ব এই আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছে—যাহা অন্য কোন ধর্ম্ম কখনই করে নাই—সত্যে পথ এক নহে, বহু, একনিষ্ঠ হইয়া একপথে যাইতে পারিলেই তুমি সত্যকে পাইবেই পাইবে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।

এই একের প্রতি নিষ্ঠা, বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা, হিন্দুর এই বিশেষত্ব শুধু তাহার আত্মচিন্তা ও আত্মদর্শনকে যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুর সমাজ-জীবনও গঠন করিয়াছে।

সমাজ-গঠনে হিন্দুর বিশেষত্ব

সমাজ-জীবনে যে মূল প্রশ্নের উদয় হয়, সমাজের জন্য আমি, না আমার জন্য সমাজ, আমরা দেখাইয়াছি পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা এখনও হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে হয় আমার মূল্যে সমাজ বিকাইয়া গিয়াছে, না হয় আমি সমাজের মূল্যে একেবারে বিকাইয়া গিয়াছি। সেখানে আমির সঙ্গে বিশ্বের যেন দোকানী ও খরিদদারের সম্বন্ধ। স্বার্থ-বুদ্ধি যেন সেই আমি ও বিশ্বের লেনদেনের কড়ি পয়সা। আমি ও বিশ্বের এই দেনা পাওনার সম্বন্ধ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যত কিছু অশান্তি, বিদ্রোহ, মারামারি কাটাকাটি।

স্বধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য

হিন্দুত্ব আমি ও বিশ্বের লেনদেনের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করে নাই। আমি ও বিশ্বের সম্বন্ধে হিন্দুত্ব প্রাণের যোগ অনুভব করিয়াছে, স্বার্থবুদ্ধির পয়সা কড়ির টান দেখে নাই। বিশ্ব ও আমির সম্বন্ধ হিন্দুর নিকট যেন পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ, যেন স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ।

ইউরোপীয় নব্য-দর্শনের উপদেশ

বার্গসঁর জীব-বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত লীলাবাদকে আমি পাশ্চাত্য চিন্তার শেষ কথা বলিয়াছি। খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের ভিতরকার সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সাম্য-তন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবনে দলাদলির প্রশ্রয় দিয়া শ্রমজীবিগণের আদর্শে সমাজ গঠন করিতে যাইয়া সমাজকে হীন করিয়া ফেলিয়াছে। বৈষয়িক জীবনে সেই সাম্য-তন্ত্র দৈহিক অভাব মোচনের উপর অত্যধিক ঝোঁক দিয়া আসল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রথমে মানুষকে জীব-ক্রমবিকাশ-

ধারার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া পরিণামবাদের উপর খুব বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু কিছু পরেই সেই বিজ্ঞানই বলিল মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হইলেও সে জীব, সে প্রকৃতির দাসানুদাস। তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শ্রেষ্ঠত্ব কি দাসসুলভ দুর্ব্বলতায়? মানুষ হীন, দুর্ব্বল, প্রকৃতির কিঙ্কর প্রমাণিত হইল। ঠিক এই সময়ে নব্য-দর্শন বার্গসঁর মুখ দিয়া বলিয়া উঠিল,—হ'লেই বা তুমি প্রকৃতির দাস, হ'লেই বা তুমি প্রকৃতির লীলার পুতুল,—প্রকৃতিই যে জগতে সার সত্য, অনন্ত, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, তুমি প্রকৃতির লীলায় আপনাকে একেবারে ভাসাইয়া দাও, আসল জ্ঞান ও আনন্দ তুমি পাইবে, তুমি সত্য উপলব্ধি করিবে।

লীলাময় বাস্তবই সারসত্য

ইউরোপ বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া জানিয়াছে। গ্রীকের সৌন্দর্য্য উপাসনা, অষ্টাদশ শতাব্দীর Economism ও বর্ত্তমান যুগে Positivism ও Humanitarianism এর ভিতর বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া উপলব্ধির পরিচয় পাই। এবং বাস্তবই যে পরমার্থ ইহাই চূড়ান্ত ভাবে বার্গসঁর দর্শনে পরিস্ফুট। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ mystic বাস্তবের ভিতরই অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দকে খুঁজিতেছেন। জগতের সার সত্য হইতেছে অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল বাস্তব। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের সত্তাই হইতেছে ভগবান্। ভগবান অনন্ত লীলাময় অনন্ত ক্রিয়াশীল। তাঁহার নিষ্ক্রিয় অবস্থা নাই। জীব-বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত নব্য-দর্শন মানুষকে জড়ের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে উপদেশ দিল।

উল্টাদিকের চাঞ্চল্যের চরম কথা

পাশ্চাত্য জগৎ বাস্তবকে যে সার সত্য বলিয়া মানিয়া লইল, চঞ্চল বাস্তবের অন্তরে যে এক বিশ্বানুপ্রবিষ্ট শক্তির লীলা দেখিয়া তাহাকে বিশ্বের একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিয়া লইল, ইহা এক দিককার চরম কথা সন্দেহ

নাই, কিন্তু হিন্দু বলিবে সেটা উল্টা দিকের, বাস্তবের দিকের, চাঞ্চল্যের দিকের। হিন্দু বলিবে সেটা ইউরোপের চঞ্চল-ভাবাত্মক সভ্যতার বাস্তব পূজার ফল। হিন্দু বলিবে, তুমি বার্গসঁর মতাবলম্বী হইয়া যোগাভ্যাস কর, সমাজ ত্যাগ কর, আত্মচিন্তা কর কিন্তু তুমি যদি এই চঞ্চল বাস্তবের অন্তরে তোমার প্রকাশ অনুসন্ধান কর, বার্গসঁ হাজারবার বলিলেও তুমি কিছুতেই শান্তি ও আনন্দ পাইবে না।

বাস্তব লীলাময় নহে, বস্তুর লীলা নহে, লীলা ভগবানের

বাস্তব চির-চঞ্চল, অনন্ত-পরিবর্ত্তনশীল। চঞ্চল বাস্তবও সত্য, হিন্দু ইহা মানিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ইহাও বলিয়াছে, বস্তুত সত্তা নিত্য ও অব্যয়,—তাহার বিনাশ নাই, বিকৃতি নাই। তাহাই আত্মা বা ভগবান। অনিত্য, চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল বাস্তব লীলাময় ভগবানের প্রকাশ। ফুলের গন্ধ বায়ুতে মিশিয়াছে। আমাদের বোধ হয় বায়ুই গন্ধযুক্ত, কিন্তু বাস্তবিক বায়ুর গন্ধ নাই, গন্ধ পুষ্পের—সেরূপ আমাদের বোধ হয় যে বাস্তবই চঞ্চল, লীলাময়, গুণময় ও কর্ম্মময়, কিন্তু বাস্তবিক বাস্তব লীলাময় নয়, লীলা ভগবানের, গুণ ও কর্ম্ম ভগবানের। ভগবান বাস্তবের অন্তরে সাক্ষী বা অন্তর্যামী থাকিয়া লীলা করিতেছেন।

হিন্দুধর্ম্মের বাস্তব

বাস্তব হইতে বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র বলিয়া ভগবানকে অনুভব করার নামই সাধনা। হিন্দু যে বাস্তবকে অমর্য্যাদার সহিত দেখিয়াছে তাহা নহে; বরং তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-সাধনার ভিতর বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধার চরম আমরা পাইয়াছি। কিন্তু হিন্দুতন্ত্র ইহাও বলিয়াছেন, লীলাময়ের শক্তিতেই বাস্তবের প্রকাশ, বৈষ্ণব-সাধন-গ্রন্থ বলিয়াছেন, বাস্তবই মহাপুরুষের লীলা। হিন্দু শুধু লীলাকেই চরম সত্য বলিয়া মানে নাই, সেই লীলাময় পুরুষের সন্ধানে হিন্দু চির-ব্যাপৃত।

যুগে যুগে হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যতা যখনই নূতন প্রাণ অনুভব করিয়াছে, তখনই অনিত্য চঞ্চল বাস্তব ও নিত্য অব্যয় অচঞ্চলের একটী নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। কখনও সেটা পুত্র ও জনক জননী, কখনও সেটা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ,—সেটা চিরকালই প্রাণের হৃদয়ের টানের উদ্বেল-আনন্দের সম্বন্ধ।

নব্য-হিন্দুত্বের ভিত্তি

বর্ত্তমান যুগে যখন বাস্তব ইউরোপীয় সভ্যতার শাসনদণ্ড হাতে লইয়া আমাদিগকে শঙ্কিত ও ত্রস্ত করিয়াছে, ইউরোপীয় সভ্যতার তুলাদণ্ড লইয়া যখন আমাদের সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতেছে, যখন ইউরোপীয় বিজ্ঞান বাস্তবকে আমাদের বিদ্যামন্দিরে পূজার আসনে বসাইয়াছে, তখন আমরা যে বাস্তবকে পরম সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা বিচিত্র নহে; কিন্তু হিন্দুত্ব সজীব রহিয়াছে বলিয়া এই লীলাত্মক বাস্তবের সহিত লীলাময় নিত্য পুরুষের আবার নূতন সম্বন্ধ খুঁজিতেছে। ইহাই উদীয়মান হিন্দুত্বের বিশেষত্ব—শক্তি পূজার দ্বারা বা বৈষ্ণবীয় সাধনার দ্বারা দেশে যে বাস্তব এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেছে তাহার সহিত নিত্যবস্তুর নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করা। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা শেষ কথা বার্গসঁর দর্শনে প্রচারিত হইয়াছে, অনিত্য চঞ্চল বাস্তবই সার সত্য,—উদীয়মান হিন্দুত্ব এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। উদীয়মান হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি হইতেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতা এই যুগে যে বাস্তবকে আমাদের দ্বারে আসিয়া পরমবস্তু বলিয়া উপঢৌকন দিয়া গেল, তাহাকে আপনার ভাণ্ডারে যেখানে হিন্দু নিত্যবস্তুকে বহু সাধনার ফলে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। ভাণ্ডার খালি করিয়া দিয়া নহে, ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লওয়া।

হিন্দু যুগে যুগে নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন নূতন অধ্যাত্ম

সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে; হিন্দুত্ব যে সজীব রহিয়াছে, হিন্দুত্ব যে ক্রম-বিকাশমান ক্রমোন্নতিশীল। হিন্দুত্ব অতীতের স্মৃতি নহে, হিন্দুত্ব মৃত অতীতের শব নহে, কল্পনার জীর্ণ কঙ্কাল নহে,—হিন্দুত্ব বর্ত্তমানের অনুভূতি। ক্রমবিকাশমান হিন্দুত্বের কথা স্মরণ করিলে প্রথমে মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা মনে পড়ে। বিরোধ ও সামঞ্জস্যের মধ্যে মহাত্মা রামমোহন হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান দর্শন মন্থন করিয়া এক অভিনব তত্ত্বদর্শনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের বিরোধী পারিপার্শ্বিকের মধ্যে হিন্দুত্বের সেই প্রথম সাড়া পাওয়া গেল। তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। নূতন নূতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও দর্শনের সৃষ্টি হইল। নূতন সম্প্রদায়েরা বলিল,—হিন্দুত্ব অসাড়, অচেতন, ইউরোপের ভাব ও চিন্তার দ্বারা তাহারা হিন্দুর তত্ত্বদর্শনকে পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইল। হিন্দুত্ব তখন অতীত মহিমার স্মৃতিতে বর্ত্তমান লজ্জাকে ঢাকিয়া রহিয়াছিল। তাহার কিছু পরেই, এখন হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যখন হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনা বিদেশের পরানুকরণ ও পরানুবাদের মোহে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন একজন তরুণ সন্ন্যাসী পাশ্চাত্য সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া সগৌরবে বেদান্তের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু অতীতের গৌরবস্মৃতি বক্ষে করিয়া সাহস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি হিন্দুর দর্শনকে প্রাণময় সত্তা দান করিলেন, যুগোপযোগী নূতন আকার দিলেন, তাহাকে তুলনামূলক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবযুগের উপযোগী করিয়া দিলেন। হিন্দুদর্শন বিংশশতাব্দীর উপযোগী হইল, নব কলেবরের পূর্ণ মহিমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পূজা পাইতে লাগিল। রাম-কৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জিগীষু হিন্দুত্বের (Aggressive Hinduism এর) প্রবর্ত্তক—তরুণ সন্ন্যাসী হিন্দুত্বকে এক অপূর্ব্ব তেজ ও গরিমায় ভূষিত করিলেন। চিকাগোর ধর্ম্মসভা নব্য হিন্দুত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিল। চিকাগোর পর রোম নগরীতে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শনের

তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করিলেন,—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা দর্শন হিসাবেও মহনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুত্ব যে শুধু সংসারকে মায়া বলিয়া কল্পনা করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দু যে এ সংসারের মধ্যেও পূর্ণ মুক্তি ও আনন্দ লাভের জন্য মধুর সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে ব্রজেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজকে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাহাই বুঝাইলেন। বর্ত্তমান ইউরোপের লোকহিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ (Humanitarianism) ও Positivism) এবং খৃষ্টধর্ম্মে ভগবানের সহিত খৃষ্টের পুত্রসম্বন্ধে যে ব্যক্তি-গত জীবনের সাধনার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাই মধুর, পূর্ণ ও বিচিত্র-রূপে বৈষ্ণব সাধনায় বর্ত্তমান,—তাহা অন্তর্জ্জাতীয় যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে অহিংসা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে চির-শান্তি আনিতে পারিবে।

বিংশশতাব্দীর হিন্দুত্বের প্রধান সম্বল এই নব্য দর্শনবাদ।

হিন্দুর সমাজ-জীবন বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতে এখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বজগতে এখন যে আমরা দিন দিন সভ্যতা ও সমাজের পূর্ণ বিকারের পরিচয় পাইতেছি আমাদের বিশ্বাস হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতা সে বিকার হইতে বিশ্বমানবকে রক্ষা করিবে। বিংশশতাব্দীর ক্রমবিকাশমান হিন্দুর ইহাই জীবনের আশা, হৃদয়ের বল, ও আত্মার আনন্দ। কিন্তু হিন্দুসমাজের সহিত তাহার আদর্শের অনেক ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। আদর্শ ও বর্ত্তমান অবস্থার এই নিষ্ঠুর ব্যবধান দূর করা হিন্দুসমাজের এখন একমাত্র সমস্যা। ওপারে হিন্দুসমাজের সোণালি রং ও রূপের ছটা, এপারে ঘনতমসাবৃত বর্ত্তমান, বর্ত্তমানের দৈন্য ও লজ্জা। মধ্যে এক ধূসর মহাসাগর। মহাসাগরের জীবনস্রোতে পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন ভাসিয়া চলিতেছে। হিন্দুসমাজের ইহাই যে অনন্ত বিরহ, অনন্ত হাহাকার, —এ ধূসর মহাসাগর সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া! সম্মুখের জীবন-স্রোতে কত সমাজ কত সভ্যতা ভাসিয়া গেল। কত মৃত আদর্শের জীর্ণ

কঙ্কাল, কত বাসনার, কত আশার শুভ্র ফেনরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা হিন্দু সমাজের সম্মুখ দিয়া বহিয়া গেল। সাগরকূলে সে কি চিরকালই শুধু অপরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে। নিয়তির ইহাই কি নিদারুণ অভিশাপ, তাহার পক্ষে কি অনন্তকালই বিচ্ছেদ-বেদনার দুঃখ। এ ধূসর মহাসাগর তাহাকে আতক্রম করিতেই হইবে। আদর্শ যে নির্ম্মম পাষাণ, সে ত কিছুতেই মধুর মিলনের জন্য আমার নিকটে আসিবে না। আমাকেই তাহার নিকট পৌঁছিতে হইবে। আর এই মহাসাগর পার হওয়া ভিন্ন গতি নাই, ইহাই যে কর্ম্মসাগর। কর্ম্মস্রোতে স্নান না করিলে, কর্ম্মমহাসাগর অতিক্রম না করিলে, আমার পক্ষে অনন্তকাল বিচ্ছেদ, অনন্ত হাহাকার।

এই ধূসর সাগরের ব্যবধান দূর হইবে কি করিয়া?

হিন্দুর দর্শনই এপার ওপারের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এবং হিন্দুর দর্শনই এই ব্যবধান দূর করিবে। দর্শনই বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে, দর্শনই বাঁধ ভাঙ্গিবে। দর্শনের প্রভাবেই হিন্দু আদর্শের পরিচয় পাইয়াছে এবং দৈন্যের মধ্যেও দর্শনই আদর্শের পূর্ণতা প্রচার করিয়াছে, এবং ইহাও বলিয়াছে বর্ত্তমানের অন্তরেই আদর্শ তাহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। দর্শনই বর্ত্তমানকে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া আদর্শের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

তাই বলিয়াছি এই হেয় ও নিকৃষ্ট বর্ত্তমানের মধ্যে হিন্দুত্বের আশ্রয় ও সম্বল হিন্দু দর্শন। রামমোহন বিবেকানন্দ ব্রজেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর নব্যদর্শন হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দৈন্যের অন্ধকারের মধ্যে ধ্রুব ও স্নিগ্ধ জ্যোতি।

অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল বাস্তব আমারই লীলা

বর্ত্তমান যুগে হিন্দুর নব্যদর্শনে ইউরোপের নিকট যে আশার বাণী প্রচার করিবে তাহা আমি ইঙ্গিত করিয়াছি। বার্গসঁর দর্শন যেখানে শেষ করিয়াছে সেইখান হইতে হিন্দু আরম্ভ করিবে। পাশ্চাত্য দর্শনের

বাস্তব সম্বন্ধে শেষ কথাকে প্রত্যাখান করিয়াই নব্য হিন্দুত্বের এখন প্রতিষ্ঠা।

উদীয়মান হিন্দুত্ব তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে,—বাস্তব সত্য, কারণ সে যে নিত্যপুরুষের বা নিত্য-লীলাশক্তির প্রকাশ। সদা চঞ্চল বাস্তব—কিন্তু বার্গস্ঁ যেমন বলিয়াছেন বাস্তবের চাঞ্চল্যের ভিতর আপনাকে ভাসাইয়া দিলে মুক্তি ও আনন্দ পাইবে তাহা নহে,—সদা চঞ্চল বাস্তবের অন্তরে নিত্য পুরুষ বা নিত্য-লীলাময়ীকে অনুভব করিতে পারিলেই চরম শান্তি ও পরম আনন্দ। বার্গস্ঁ যেমন বলিয়াছেন, বিশ্বের লীলার মধ্যে ডুবাইয়া দিলে চরম আনন্দ পাইবে তাহা নহে। আমি যদি বিশ্বের লীলাস্রোতে ভাসিয়া গেলাম তবে আমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? উদীয়মান হিন্দুত্ব বিশ্ব ও আমির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বলিবে, বিশ্বের অন্তরে আমি, আমাতে বিশ্ব রহিয়াছে। বিশ্ব লীলাময়, কিন্তু সেটা বিশ্বের লীলা নহে, সে যে আমারই লীলা। আমিই লীলা করিয়া আমার শক্তি অনুভব করিতেছি, আনন্দ ভোগ করিতেছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধের মীমাংসা

বিশ্ব ও আমার মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমিও স্বাধীন রহিলাম, বিশ্বধর্ম্মেরও মর্য্যাদা হানি হইল না। স্বধর্ম্মও রহিল, বিশ্বধর্ম্মও রহিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে যুগে যুগে হয় স্বধর্ম্মকেই প্রশ্রয় দিয়া বিশ্বধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়াছে, অথবা বিশ্বধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া তাহার নিকট স্বধর্ম্মকে বলিপ্রদান করিয়াছে, এই অনন্ত বিরোধের মীমাংসা উদীয়মান হিন্দুত্বে পাওয়া যাইবে।

সমাজ-জীবনে নব্য-হিন্দুত্বের দান

নিজ স্বার্থ ও বিশ্বরাজার অর্থের বিরোধ নিবারণ যে শুধু অধ্যাত্ম জগতে একটা শান্তি ও আনন্দের সূচনা করিবে তাহা নহে। সমাজ-জীবনেও

স্বধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্মের একত্বানুভূতি সমস্ত অসামঞ্জস্য, সমস্ত বিরোধ, সমস্ত অশান্তি দূর করিবে। সামাজিক সাম্যতন্ত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সাম্যভাব ও অধিকারভেদ, রাষ্ট্রের মহিমা ও ব্যক্তিত্বের গৌরব, বৈষয়িক উন্নতি ও অধ্যাত্মসাধনা সকলের সমন্বয় বিধান, সকলকে আশ্রয় করিয়া সকলেরই সুবিধাবিধান করিয়া নব্য-হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্মক্ষেত্রে যেমন নব্য-হিন্দুত্ব পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-দর্শনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিবারণ করিয়া যেমন মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে, সমাজ-জীবনেও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট ব্যর্থতাকে তাহার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্বাস দিবারই জন্য ইহার বিকাশ। আর এই নব্য-হিন্দুত্বে হিন্দুর যাহা কিছু পুরাতন তাহা আশ্রয়লাভ করিবে এবং যুগ-শক্তি যাহা কিছু নূতনের সৃষ্টি করিতেছে তাহার পূর্ণ মহিমা ইহাতে বিরাজিত থাকিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্ব-গ্রাসী প্রয়াসের ব্যর্থতাকে সান্ত্বনা দিয়া, ভারতীয় সভ্যতার বিপুল সাধনার সাফল্যকে আশ্রয় করিয়া নব্য-হিন্দুত্ব বিশ্বমানবের এই প্রলয়ের দুর্দ্দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে নব-প্রসূত শিশু প্রলয়ের ঘনঘোর মহাষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শিশুই এই শক্তিমদমত্ত, অতি-মানুষের অহঙ্কারে স্ফীত বর্ত্তমান ইউরোপ কর্ত্তৃক অপমানিত বিশ্বমানবদম্পতীর বক্ষ হইতে পাষাণ সরাইয়া দিবে, তাঁহাদিগকে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবে,—তাহার জন্মতিথিতে আমরা মহোৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম, এখন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি কবে সে কংসকারাগারের দ্বার খুলিবে, কবে সে গুরুভার পাষাণ সরিয়া যাইবে, কবে সে ভীষণ শৃঙ্খল খুলিয়া যাইবে।

বিশ্বমানবের শৃঙ্খল মোচন

বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে তাহার জন্ম হিন্দু-সভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু। তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর তুমিই বিশ্ব-মানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহ-

শৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারই জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমার সম্পদের দ্বারকা, তোমার ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমার শেষ শয়নের সাগর-সৈকত। বিশ্বের অচল নিগড় তোমারি কংস-কারাগার। আর তুমি সেই কারাগারের দ্বার মোচন করিয়া বিশ্বমানব-দম্পতীকে উদ্ধার করিবে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য তপস্যাই তোমার হৃদয়। বিশ্বমঙ্গলার্থ নিখিল বিদ্যা তোমার অনুপম তনু। নিখিল সদনুষ্ঠান তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিশ্বের কল্যাণধ্যান তোমার আকৃতি। বিশ্বের কল্যাণের জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিবেন তাঁহারা তোমার প্রাণ-স্বরূপ। হিন্দু তুমি কি ইহা অনুভব করিতে পারিবে যে,— বিশ্বের কল্যাণ-ধর্ম্ম তোমার আত্মা-স্বরূপ। যদি তুমি তাহা অনুভব করিতে পার তাহা হইলে জানিও বর্ত্তমান ভীষণ দুর্যোগ, অন্ধকারের মধ্যে বিশ্ব-বাসুকী অনন্ত মুখে জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তোমাকে সেই কালচক্র হাতে লইয়া মোহ ও মত্ততার ধ্বংস করিবার জন্য তোমার শরণ লইয়াছেন।

সর্ব্বজাতি-মণ্ডল

আমরা পূর্ব্বে হিন্দুর সমাজের ও রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নারায়ণের বিরাট শরীরের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছি। সমাজদেহের প্রতি অঙ্গে যেরূপ নারায়ণের প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে পরস্পরের ও সমূহের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে সেরূপ তাঁহারই বিরাট প্রাণ বিভিন্ন জাতি মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেকের ও সকলের স্বধর্ম্মের ও বিশ্বধর্ম্মের বিকাশ সাধনের দ্বারা বিশ্বমানবের ও বিচিত্র জাতি সমূহের কল্যাণ নির্ণয় করিয়াছে।

হিন্দুর এই মহৎ কল্পনা সেই মহাভারতীয় যুগের। সেই কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে আধুনিক কাল ও পাত্রভেদে আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আমরা এইখানে উহার পুনঃ সঙ্কলন করিতেছি।

মহাভারতের এক পর্ব্ব

কাল—বর্ত্তমান

স্থান—পাশ্চাত্য জগৎ

অধ্যায়—স্ত্রী-বিলাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষু দ্বারা রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে ব্যথিত হইয়া তিনি মধুসূদনকে করুণ বচনে কহিলেন, বৎস, ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলুলায়িতকেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্বস্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান

হইতেছে। আহা, পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ যে সকল বীরের সমীপে সদা সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্রসকল তাঁহাদের সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাঁহাদিগকে হেমদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গমেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে। এই দেখ, মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন রমণী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া, "হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কতকগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। হা কি কষ্ট, ঐ দেখ, কোন কোন মহিলা বীরগণের দেহের কোন কোন অংশ না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ রণভূমিময় দ্রুতপদে বিচরণ করিতেছে।

কাল—ভবিষ্যৎ

স্থান—নূতন ভারত

অধ্যায়—অনুগীতা

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্, পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর জগতে ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ, পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কিছুকাল মহাহ্লাদে জগতের প্রসিদ্ধ নগরী ও রাজধানীতে এবং যাবতীয় রমণীয় স্থানে বিচরণ করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থ মহাসভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন, যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি।

তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্বনিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময় আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে ভারত, তুমি আমার পরম প্রিয়, তোমার সহিত বহুদেশ হইতে আগত বহুজনসমাকীর্ণ সর্ব্বজাতীয় সভার মধ্যে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি, এ কারণে আমি তোমার নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য। যাহাই হউক আমি পুনরায় তোমার নিকট সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিব।

পূর্ব্বে তোমায় আমি লোকক্ষয়কারী উগ্র কালস্বরূপ দেখাইয়াছি—এইবার আমার পালনকারী স্নিগ্ধ বিশ্বাত্মক পরম রূপ দেখাইতেছি।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট পুনরায় বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই বিশ্বরূপ প্রজ্জলিত পাবকের ন্যায় ভীষণ নহে, শুক্লবর্ণ অতি সৌম্য মহাসমুদ্রের ন্যায় স্থির প্রশান্ত ও মনোরম।

ধনঞ্জয় সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রীতমনা হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্, আপনার উদরে স্বর্গধাম, পৃথিবী, রসাতল বর্ত্তমান। ক্ষিতি জলাদি পঞ্চভূত ও নিখিল স্বামীর একমাত্র আধার, সকলের আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর যে আপনি আপনাকে বারবার নমস্কার করি। আপনার দেহে রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, নিতি ও সপ্তর্ষিগণ বর্ত্তমান। আপনি শীত উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। আপনি ঋতু, উৎপত্তি, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবৎ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত।

দণ্ডগ্রহণ করিয়া আপনি সকল জাতির সকল লোককে পালন করিতেছেন। আপনি বিশ্বসংসারের একমাত্র রাজা; আপনি একাকী সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বিশ্বসংসারের একমাত্র রাজা এবং আপনি একমাত্র প্রজা হইয়া আপনার ধর্ম্মপালন করিতেছেন। আপনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজীগিষু। আপনি সংহারক, আপনি হত। আপনি অস্ত্রধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। আবার আপনিই শান্তিদাতা, শান্তিরক্ষক, মনুষ্যরূপী ও করুণমূর্ত্তি।

নিখিল জাতির সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন আপনার ত্রিলোচন। নিখিল লোকের বিভিন্ন মন্ত্র, স্তুতি, কীর্ত্তন, স্মরণ আপনার শ্রবণ। সর্ব্বলোকের যজ্ঞ ও নিখিল কল্যাণধর্ম্ম আপনার অনুপম তনু। নিখিল লোকের শিষ্টাচার, রীতিনীতি, চারুশিল্পকলা আপনার অঙ্গাভরণ। বিশ্বসংসারের কৃষিশিল্পবাণিজ্যব্যবসায় আপনার সর্ব্বদিক্‌বিস্তৃত হস্তপদ।

আপনি পৃথিবীর যাবতীয় জাতির নিকট বিভিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে প্রকটিত করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনি কাহারও নিকট হইতেছেন ব্রহ্মজ্ঞান, কাহারও নিকট হইতেছেন ক্ষত্রিয়বল, কাহারও নিকট বৈশ্যশক্তি। আপনাকে যে ভাবে যে জাতি ভজনা করে, তাহাকে আপনি সেই ভাবে অনুগ্রহ করেন, যেহেতু আপনাকে ছাড়িয়া অর্থ অথবা সৈন্যবলের ভজনা করিলেও তাহারা আপনারই ভজনমার্গ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। আবার আপনিই সর্ব্বজাতিস্বরূপ হইয়া স্বতন্ত্র জাতির কার্য্য ও অকার্য্যের মধ্যে বিশ্বে সুষমাসামঞ্জস্য আনিতেছেন। যেরূপ সকল দ্বন্দ্বের আপনিই স্রষ্টা, সেরূপ সকল দ্বন্দ্ব আপনাকেই সমাশ্রয় করিতেছে।

বহুনদী যেরূপ বিচিত্র পর্ব্বতপ্রদেশ, বনভূমি, নগর, গ্রাম অতিক্রম করিয়া সাগরসঙ্গমতীর্থে পৌঁছিয়া অনন্ত কল্লোল-গীতিতে আপনাদের হর্ষ জ্ঞাপন করে, সেরূপ বিভিন্ন জাতি তাহাদিগের বিচিত্র ভাবসম্পদ আপনাকে

অর্পণ করিয়া পরম জ্ঞানানন্দ লাভ করে। আমি আজ আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সর্ব্বজাতির সেই মহামিলনের বিপুল হর্ষগীতি শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম। আপনি সপ্তসুরের ভিতর দিয়া যেরূপ রাগ-রাগিণীতে প্রকাশিত হন, সেরূপ নব নব বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া বিশ্ববীণায় এক নিত্যমঙ্গল সুর রচনা করিতেছেন। আপনি এক একটি বিভিন্ন শব্দ, আপনি গান, আবার আপনিই গায়ক। হে শাশ্বত গায়ক, আমি মহামিলনের সেই গান শুনিয়া ধন্য হইলাম। সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া আপনি যেরূপ কালবিভাগ করেন এবং আপনারই দক্ষিণায়ণ উত্তরায়ণ হইয়া থাকে, সেরূপ জগৎক্ষেত্রে আপনি সভ্যতারূপে উদিত হন। আপনারই ক্রমবিকাশ ও অবনতি হইয়া থাকে। ইতিহাস আপনারই তির্য্যগ্‌ ও সরল গতি কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আপনিই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ।

প্রত্যেক সমাজে আপনি যেমন প্রত্যেক বর্ণ হইয়া পরস্পরের সমবায়ে সমাজদেহের পূর্ণ উন্নতির লক্ষ্যে বর্ণগুলিকে পরিচালিত করিতেছেন, সেরূপ বিরাট্ সর্ব্বজাতি-দেহের অন্তরে থাকিয়া আপনি অলক্ষ্যে সমুদয় জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার সাফল্য ও বিফলতার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি, সুশাসন, মাৎস্যন্যায়ের মধ্য দিয়া আপনি জাতিরূপে ধরাতলে মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। আপনিই জাতিরূপে, মনুষ্যরূপে, বিশ্বসংসাররূপে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আপনার বিরাট্ বিশ্বদেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহে আমি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাতিসমুদয়ের পরস্পর ও সমষ্টির কল্যাণবিধান নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইলাম।

জগতে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ, সুন্দর ও অসীম, আপনি তৎসমুদয়-স্বরূপ। সকলের অন্তরে থাকিয়া আপনি প্রত্যেকের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশী। আপনি মিলনের কর্ত্তা এবং আপনিই মিলনের একমাত্র সাক্ষী।

আপনি সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন এবং সকল জাতির শিক্ষা, গঠন ও শাসনের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে স্বধর্ম্মে নিয়োজিত রাখিয়া আপনার বিরাট্ সত্য-শিব-সুন্দর বক্ষে নিরন্তর টানিয়া লইতেছেন। আপনি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্ব-সংহারক। আপনি বিশ্বদেব, আপনি জগন্নিবাস। আপনি অচিন্তনীয়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।

আজ এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জাতিতে জাতিতে অবিচ্ছিন্ন মৈত্রী স্থাপনের সুচেষ্টার সহিত অনুন্নত ও শিশুজাতি-সমূহের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের যত্ন চলিতেছে।

সর্ব্বজাতিমণ্ডল একত্রে মিলিয়া অথবা কোন এক বিশিষ্ট জাতি ভার-প্রাপ্ত হইয়া অনুন্নত জাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ; এই লইয়া বাদপ্রতিবাদের যুদ্ধ চলিতেছে।

মরক্ক ও ইজিপ্টে একাধিক জাতির ভার গ্রহণের বিষময় ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরদিকে সর্ব্বজাতিমণ্ডল যদি কিছুরই ভার গ্রহণ করিবার অবসর না পায়, তবে উহা যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মত বস্তুতন্ত্রহীন থাকিয়া যাইতে পারে, এই ভয়ও নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়।

যিনিই দায়িত্ব লউন না কেন, গোটাকতক বাঁধাবাঁধি নিয়ম এই শান্তি স্থাপনের সুযোগে সৃষ্ট না হইলে অনুন্নত ও অর্ব্বাচীন জাতিগণের শোষণ ভয়ানক আকার গ্রহণ করিবে।

বার্লিন ও ব্রুশেল্স কংগ্রেসদ্বয় উক্ত অনুচ্চ জাতিসমূহের ব্যবহারে যে নিয়মসূত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইগুলিকে আরও ব্যাপক, বিশুদ্ধ ও সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। আরও বিভিন্নদিকে অনুচ্চ জাতিসমূহের রক্ষা কল্পে তাহাদের সমাজের শান্তি ও সুব্যবস্থার জন্য কয়েকটী নিয়ম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সৃষ্টি ও পালন করা চাই ; এবং সেই নিয়মগুলির লঙ্ঘনে শাস্তির ব্যবস্থা চাই।

প্রায় একমাস পূর্ব্বে মাদ্রাজে ও ট্রিচনপল্লীতে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমি, জগতের গ্রীষ্মপ্রধান খণ্ডে অনুন্নত জাতি সমুদয়ের রক্ষা ও বিকাশসাধনকল্পে যে সকল নিয়ম কানুন অবশ্য-প্রতিপাল্য তাহাদের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। এই স্থলে আমি কতকগুলি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

সর্ব্ব-জাতিমণ্ডল বা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কোন বিশিষ্ট জাতি বা জাতি-সংঘ এই সকল নিয়ম কানুনের মর্য্যাদা যদি এখনও না বুঝে, তবে শাসনের সহিত শোষণের, সভ্যতার সহিত বর্ব্বরতার, বাণিজ্যের সহিত স্বার্থ সাধনের সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে না, এবং বিশ্বজগতে অবিচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন সুদূরপরাহত হইবে।

যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, আমরা একে একে তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

(১) প্রত্যেক অনুন্নত জাতির পক্ষে মদ্য বিক্রয় এবং মদের ব্যবহার বিশেষরূপে কমাইয়া দিতে হইবে। এবং স্থানীয় মদ্যব্যবসায়ীরা আন্ত-র্জাতিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইবেন।

(২) শ্বেত বা কৃষ্ণকায় উভয় প্রকার ব্যক্তির প্রতি যৌন সম্বন্ধীয় কদাচারের জন্য আইন সমভাবে কার্য্য করিবে; এবং জারজ পুত্র-কন্যা-গণের শিক্ষাদীক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) উপদংশ প্রভৃতি রোগের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৪) কৃষি এবং খনির কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র পুরুষ শ্রমী গ্রহণ চলিবে না—স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকেও লওয়া চাই। স্ত্রী শ্রমজীবীর সংখ্যা পুরুষ শ্রমজীবীর সহিত তুলনায় কম হওয়ার জন্যই নীল-কোকো চা-কফি প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে এবং খনিতে নানারূপ ব্যভিচার এবং কদাচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৫) আইনের চশমা চক্ষে দিয়া দেখিলে মনে হয় যে, ক্রীতদাস-প্রথা জাতি হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এই হীন প্রথা এখনও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। অনুন্নত জাতিদিগকে শ্বেতকায় মহাজনেরা যেরূপ নানাভাবে ঋণের জন্য এবং অন্যান্য কারণে জোর জবরদস্তি করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্নখণ্ডে খাটাইয়া থাকেন, তাহা ক্রীতদাসপ্রথার নামান্তর মাত্র। এই দুর্ব্যবহার দূর করিবার নিমিত্ত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শ্রমজীবীর নিয়োগকালের চুক্তিতে যাহাতে অজ্ঞতা বা জুয়াচুরীর জন্য তাহারা অন্যায়ভাবে বিদেশ হইতে আনীত হইয়া শ্রম-আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ভোগ না করে, তাহার প্রতিবিধান চাই। শ্রমজীবীদিগের বস্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও সকলের অনুমোদিত আইন কানুন চাই।

(৬) গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে শ্বেতকায়গণ নানা প্রাকৃতিক কারণে চিরকাল বাস করিতে পারেন না। এই সকল স্থানে তদ্দেশবাসীদিগকে স্থানীয় কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আত্মোন্নতি লাভের সুযোগ এবং শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বিধান আবশ্যক।

(৭) জমির উপর আধিপত্য স্থাপনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় এবং জমি বিভাগ বিষয়ে অদূরদর্শিতায় অনেক স্থলে স্থানীয় লোককে বলপূর্ব্বক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত এবং স্বাধিকারচ্যুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের লোকই স্ব স্ব সভ্যতার আদর্শে এবং দেশের প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও রীতিনীতি অনুসারে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে তাহাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় জমির উপর অধিকার এবং তাহাদের স্ব স্ব আদর্শের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কঠিন আন্তর্জাতিক বিধান থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে শ্বেতকায়-গণ প্রাকৃতিক কারণে চিরবসতি করিতে পারিবেন না, তথাকার জমিতে তাঁহাদের চিরন্তন অধিকার থাকিতে পারিবে না। জমি গভর্ণমেণ্টের

অধীনে থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোনও শ্বেতকায় মহাজনকে কিছু জমি দিতে পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে দুটী সর্ত্ত করিতে হইবে। (১) সে জমিটীকে অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। (২) সময়মত বিজ্ঞাপন দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার নিকট হইতে যখন ইচ্ছা জমির অধিকার ফিরাইয়া লইতে পারেন। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে এই উপায় অবলম্বন করিলে শ্বেতকায়গণের তথায় চিরবসতি অসম্ভব হইবে অথচ তাঁহারা স্থানীয় লোকদিগকে কৃষি এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন।

(৭) অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্যক্ প্রচার হওয়া চাই। সভ্য জাতিগণের মধ্যে যাহারা অনুন্নত জাতির শাসনের ভার লইবেন, তাহাদিগকে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতেই হইবে।

যুগধর্ম্মবিকাশে নব্য-হিন্দুত্ব

রামমোহন-ভূদেব

এতকাল ধরিয়া যে নূতন ভারতের সৃষ্টির আয়োজন চলিতেছিল, তাহা অনেকটা অন্ধকার পথে খঞ্জের হাতড়াইয়া যাওয়ার মত, আদর্শের ধ্রুব আলোকে নিশ্চিত যাত্রার মত নহে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, ভূদেব, ব্রজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা যুগধর্ম্মবিকাশে হিন্দুসভ্যতার সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আজকালকার সব আন্দোলনকে অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়াছে, সেখানেও দেখি এক অভিনব ভাবুকতা। রামমোহন ও ভূদেবের বিশেষত্ব এই, তাঁহারা দেশকাল অনুসারে নূতন করিয়া সমাজগঠনের এক বিপুল প্রয়াস সাধন করিয়াছেন। রামমোহন-ভূদেবের চিন্তার মধ্যে আমরা জগতে তুলনা-মূলক সমাজতত্ত্বের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাই। দুইজনই বর্জ্জনের দিক্ দিয়া নহে, সম্মিলনের দিক্ দিয়া—গঠনের দিক্ দিয়া সমাজসংস্কার চাহিয়াছিলেন। একজন হইলেন একটা অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা; আর একজন হইলেন, নব্য-হিন্দুত্বের নূতন প্রচারক। আমাদের দুরদৃষ্ট ইউরোপীয় বর্জ্জনকারী আদর্শের প্রতিপত্তির জন্য দুইজনকেই আমরা হারাইতে বসিয়াছিলাম। একজন অনুমিত হইয়াছিলেন হিন্দুসমাজের বাহিরে ব্রাহ্ম নব্যসংস্কারকগণের দলপতি, আর একজন হইয়াছিলেন যুগধর্ম্মের বাহিরে গোঁড়া সনাতন-পন্থী।

বিবেকানন্দ

রামমোহন ভূদেবের জীবন সম্বন্ধে দেশ যে ভুল করিয়াছে, বিবেকা-নন্দের জীবন ও তাঁহার বাণী সম্বন্ধে সে ভুল হয় নাই। তরুণ সন্ন্যাসী

স্পষ্ট-ভাবে হিন্দুর প্রকৃত সাধনার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় ও জ্বলন্ত দেশপ্রীতিতে জাতিকে সাবধান করিয়াছিলেন, ছুৎমার্গের সহিত প্রকৃত হিন্দুর কিছুমাত্র সংস্রব নাই—এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুর অধ্যাত্মজীবন ও সমাজের পুনর্গঠনের বাণীও বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন। শুধু তাহা নহে, তিনি বিশ্বজিগীষু হিন্দুত্বের প্রবর্ত্তক। পাশ্চাত্যবাসী অনেকে তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া ভারতের চিন্তা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। জগৎ বিশেষতঃ আমাদের দেশ চিরকালই "বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশল" অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টিকেই শ্রদ্ধা করে—রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের নিকট সে তাহাই পাইয়াছিল। ত্যাগের দণ্ডের উপর বৈরাগ্যের নিশানে যে তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কিত থাকে, কেবলমাত্র তাহাই আমাদের জাতির একমাত্র নায়ক ও নিয়ন্তা, চিরকাল তাহাই হইয়াছে ও হইবে। সন্ন্যাসীর যষ্টি আমাদের জাতির একমাত্র শাসন-দণ্ড।

বর্ত্তমান যুগ

তাহার পর আর এক যুগ অতীত হইয়াছে। কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অতীত ভারতের চিন্তার সম্পদ্ আজ সভ্য জগতে যথোচিত গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে সেই ভাবুকতার আন্দোলনের যুগে শ্লেগেল সপেনহার, কুঁজা, গেয়েটে, হার্ডারের উপর ভারতীয় চিন্তা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। জার্ম্মাণীতে বুলর-কিলহরণ, ফ্রান্সে সিল্‌ভান্ লেভি, আমেরিকায় ল্যান্‌মান ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। Indology এখন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আদরের সামগ্রী। ভারতের বর্ত্তমান চিন্তাও বিদেশে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বমানবসভায় ভারতের চির-পুরাতন-চিরনূতন অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া বিভিন্ন জাতি-

সমুদয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান সভ্যতার দুরূহ সমস্যাগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ভারতীয় চিন্তার বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ সাধনার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবে ভারতের বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। অবনীন্দ্র-নন্দলালের সাধনালব্ধ ভারতীয় চিত্রকলা ভারতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যের আর একটি নূতন বিকাশ। ভগিনী নিবেদিতার গুরুভক্তি ও প্রাচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা অপূর্ব্বভাবে মিশ্রিত হইয়া ভারতের সমাজ, আর্ট ও ইতিহাসের ধারাটিকে বিশ্বজগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিতেছিল। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের ও তাঁহাদের দেশের সম্মান আরও বৃদ্ধি করিতেছেন। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ব ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও অনেক লোকের প্রতিভা সত্য সত্যই তাঁহাদের অগ্রণী ভারতীয় সভ্যতা-প্রচারকগণের জ্ঞানগরিমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে।

নূতন সমস্যা

রামমোহন-ভূদেব-বিবেকানন্দ যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আজ সফল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রে, সমাজগঠনে, শিল্পে, বিদ্যানুশীলনে সকল ক্ষেত্রেই জাতীয় আদর্শের ধারাটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহারই অব্যাহত ক্রমবিকাশের সুযোগ বিধান করা—ইহাই জাতির প্রধান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।

রামমোহন-বিবেকানন্দের চিন্তা ও সাধনা সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বে বিশ্বজগতে কত না চিন্তা, সাধনা, কত না শক্তির খেলা হইয়া গেল। ভারতকে বিশ্বশক্তির উপযোগী করিয়া আবার সেই সনাতন চিরনূতন আদর্শকে নূতন করিয়া নূতন ভাবে বুঝিতে এবং প্রচার করিতে হইবে। প্রাণ কখনও শিথিল অসাড় দেহযন্ত্রে থাকে না। আদর্শ যদি সত্য হয়,

তবে তাহা অনুভব করিতে হইলে অতীতের কল্পনার জীর্ণ অস্থির আশ্রয় লইতে হয় না, বর্ত্তমান সতেজ সরল জীবনের নিবিড় অনুভূতিতে তাহার প্রকাশ। সনাতন হিন্দু-সভ্যতার আদর্শ সত্য, তাই বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার নূতন নূতন সমস্যাগুলির সমাধানে তাহা অতি সুন্দরভাবে উপযোগী।

বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান সমস্যাগুলি "উপাসনায়" ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং হিন্দুসভ্যতা বর্ত্তমান যুগের এই দুরূহ প্রশ্নসমুদয়ের কি ভাবে মীমাংসা করিয়াছে, অথবা করিতে চাহে, তাহাও দেখান হইয়াছে।

হিন্দুসভ্যতার সমাজগঠনের বিশেষত্ব

মানুষের সহিত সমাজের সম্বন্ধস্থাপনে হিন্দুসভ্যতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে খাট করিতে দেয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্র ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান লোক-সমূহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া একটা বিরাট্ লৌহযন্ত্রের মত যে ব্যক্তিত্বকে পিটিয়া পিষিয়া পোড়াইয়া নিজের প্রয়োজনের মত গড়িয়া তুলিতেছে, তাহা হিন্দুসভ্যতার আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাষ্ট্র যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্র ক্ষেত্রে আপনার হুকুমজারি করিবে (State socialism), ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাসে কখনও বিধাতাপুরুষ লেখেন নাই। ঐশ্বর্য্য ও লোকবল, রাষ্ট্র ও সমাজ-শক্তি প্রাচ্যজগতে কেন্দ্রাভিমুখী নহে; সমাজক্ষেত্রে তাহারা অবাধ ব্যাপ্তির পথ খুঁজিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্রীয় দলাদলি (Party Government), আম্‌লাতন্ত্র (Bureaucracy), অথবা লোকসংখ্যার মতানুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ (The right of the majority over the minority)—ইহাও সেই একই আদর্শের ফল, যাহা সমাজ-যন্ত্রকে খুব কার্য্যকুশল করিবার জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে

বলি দিতে চাহিয়াছে, এবং রাষ্ট্র ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বাহ্য মহিমা, গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমাজের আর সমস্ত বিচিত্র শ্রেণী ও সমূহের ক্ষতিসাধন ও তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধনগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি, পারিবারিক জীবনকেও বিসর্জ্জন দিতে আজ কুণ্ঠিত নহে। হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্য জগৎকে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা ও রাষ্ট্র-শক্তির একান্ত বিনাশ সাধন করিতে বলিতেছে না, কিন্তু ইহা এই বলিতে চাহে যে, মানুষ রক্তের টানে, স্বাভাবিক সম্বন্ধের টানে, সমান বা অনুরূপ কার্য্য, রীতি নীতি বা রুচির টানে যে সকল শ্রেণী, সমষ্টি, গণ বা সমূহে আবদ্ধ হয়, সেগুলিকে নষ্ট করিয়া যদি শুধু একটা বিরাট্ কৃত্রিম রাষ্ট্র বা বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বভুক্ করিয়া তুলা হয়, তাহা হইলে মানুষ এক-দিকে যেমন স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের বিকাশসাধনের সুযোগ না পাইয়া স্বৈরাচারী হয়, অপরদিকে রাষ্ট্রও আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত তাহার ঘাড়ে চাপিবার সুযোগ পাইয়া তাহাকে দিয়া যা ইচ্ছা করাইয়া লয়। রাষ্ট্রের হুকুম সৎই হউক অসৎই হউক,—সে বিচার করিবার অধিকার ও শক্তি তাহার থাকে না। রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান ইউরোপে অধিকতর ফলোৎপাদনক্ষম হইলেও ব্যক্তির স্বাভাবিক ও প্রাথমিক বৃত্তিনিচয়ে বিকাশের প্রতিরোধ এবং সমূহ জীবনের মূলশক্তির বিনাশ সাধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন মানব-জীবনের অভিব্যক্তির অন্তরায় হইয়াছে। ট্রাষ্ট কার্টেল অথবা সাম্রাজ্য কোন বিশেষ দিকে সমাজের যোগ্যতা দান করিতে পারে সত্য; কিন্তু সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে তাহারা যে বিঘ্নস্বরূপ ইউরোপীয়গণই এখন তাহা স্বীকার করিতেছেন। হিন্দুসভ্যতার সমাজ-গঠনে বিশেষত্ব এই যে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত অসংখ্য দল, শ্রেণী বা সমূহের সে পুষ্টিবিধান করিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনে গোত্র ও একান্নবর্ত্তী পরিবার, সমাজজীবনে বর্ণ ও আশ্রম, শিল্পজীবনে জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পঞ্চায়েৎ

ও গ্রাম্যশালিশী সমিতির মর্য্যাদা হিন্দুসভ্যতা চিরকালই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

পাশ্চাত্য ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা ব্যবসায় ও শাসনযন্ত্রের সুবিধা ও বাহ্যিক মহিমাহেতু সকল সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া জগৎময় সকল ক্ষেত্রে যে সমাজের মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তাহা সভ্যতার বিনিময়ের চিহ্ন, সম্মিলনের নহে। তাহা অস্বাভাবিক ও ধ্বংসপ্রবণ। বিশ্ব সভ্যতার পক্ষে তাহা অমঙ্গলদায়ক। এ বিধি কিছুতেই টিকিতে পারে না। প্রত্যেক সভ্যরা তাহার বিশেষত্বগুলি বজায় রাখিয়া উন্নতির পথে সম্মিলনের দ্বারা পুনর্গঠনের দ্বারা অগ্রসর হইবে।

ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশ

ভারতীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎক্রমবিকাশে ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা প্রশ্রয় পাইবে না। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা সমূহগুলি নূতন জীবনে উপযোগী হইয়া নূতন দায়িত্ব বরণ করিয়া লইবে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনে মণ্ডল, সর্দ্দার, মুখ্য, বারিক, দিয়ান, পঞ্চায়েৎ, সমিতি ও সভা তাহাদের নূতন যুগের নূতন দায়িত্ব না পাইলে বা বুঝিলে আমরা বিদেশীয় ডিমোক্রেসির অনুষ্ঠান লইয়া মিথ্যা আড়ম্বর করিবমাত্র। বর্ণবিভাগ, জাতিবিভাগ, আশ্রম ও সম্প্রদায়বিভাগ সবই থাকিবে, কিন্তু তাহাদের জীর্ণ বেদনাদায়ক কঙ্কালগুলা নহে, প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া ব্যক্তির স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে তাহারা পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ বিধান করিয়া দিবে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা নহে, ভারতবর্ষের বিচিত্র কৃষক ও শিল্পীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি শ্রেণী, দল, ও সমিতিগুলির বিরাট সমবায়দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইবে। পাশ্চাত্য জগতের শিল্পানুষ্ঠানের যে বিষময় ফল, অর্থের তারতম্য সমগ্র সমাজকে হীনবল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় সমবায়!

বিদেশের রপ্তানি রেফাইজনের আংশিক সমবায় নহে। যে সর্ব্বাঙ্গীন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায়-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের গ্রাম্যসমাজে কৃষি ও শিল্পকার্য্য প্রণালী যুগপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা পুনর্জীবিত করিয়া, —বাষ্প, গ্যাস্ অথবা তেলের ছোট এঞ্জিনের বা তাড়িতের সাহায্যে আধুনিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রণালীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়িয়া তুলিয়া। কৃষিকর্ম্ম, দ্রব্যোৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রচলন বৈষয়িক জীবন অর্থের অনৈক্যকে স্বীকার করিয়া এবং অর্থের অত্যাচারকে নিবারণ করিয়া একই সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের আশা পূরণ ও মামুলী ধর্ম্মবিজ্ঞানের আশঙ্কা দূর করিবে। সকল ক্ষেত্রে সমূহ-গুলি নূতন যুগের নূতন অভাব পূরণের উপযোগী হইবে। সমাজ-ব্যবস্থায় সমূহগুলির সমবায়ে তাহাদের অবাধ পুষ্টিসাধনের সুযোগলাভ, এবং শাসন ও শোষণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া যেমন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায় ও পরিচায়ক, তেমনি ব্যক্তি-মানবেরও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির সূচনা করে।

হিন্দুর সর্ব্বেশ্বরবাদ

ভারতবর্ষের সমূহ-তন্ত্রের সত্য সত্যই বিশিষ্টতা এই যে, ইউরোপীয় সমাজক্ষেত্রের রাষ্ট্র অথবা শিল্পানুষ্ঠানের মত কোন একটি সমূহ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া অন্য প্রাথমিক সমূহগুলির বা ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আপনাকে পুষ্ট করে না। প্রত্যেক সমূহ স্বাধীনভাবে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় এবং ব্যক্তি ঐ সকল সমূহের জীবনের মধ্যে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিস্তৃতি ও পরিণতি সাধন করে।

অন্তর্জ্জীবনে হিন্দু কখনও একটা শূন্য বস্তুতন্ত্রহীন একেশ্বর বাদকে প্রশ্রয় দেয় নাই। হিন্দুর একেশ্বরবাদ বহুকে ত্যাগ করিয়া নহে, বহুকে আশ্রয় করিয়া। প্রকৃতির বিচিত্র খণ্ডরূপে, মানবজীবনের বিচিত্র সম্বন্ধে

সেই একেরই প্রকাশ হিন্দু অনুভব করিয়াছে। সমাজজীবনেও তেমনি হিন্দু একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা সর্ব্বভুক্ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে নাই। নানা বিচিত্র প্রাথমিক সমূহের স্বাধীনতা গৌরব হিন্দুসমাজে অক্ষুন্ন আছে, হিন্দুর সমূহতন্ত্র সমাজগঠনে সেই এক রীতিরই প্রকাশ, যাহা অন্তর্জ্জীবনে বেদান্ত-বাদে বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক লীলাতত্ত্বে প্রকৃতির বা মানবজীবনের বিচিত্র খেলায় সেই একেরই লীলা দেখিয়াছে। হিন্দু ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে বলিয়াই সে রূপেও ভগবানকে দেখিয়াছে। তথাকথিত একেশ্বরবাদীর ভগবদুপলব্ধি বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া সে ভগবানের অনন্ত রূপও দেখিতে পায় না, খণ্ড রূপও পায়না। ভারতের "বহুস্যাম" সেই অমোঘ-বাণী হিন্দুর সমাজব্যবস্থায় বহুসমূহের সৃষ্টি ও বিকাশে দেখা গিয়াছে। অধ্যাত্ম জীবনে হিন্দু খণ্ডরূপ হইতে বিভিন্ন সাধনমার্গের দ্বারা অনন্ত বিশ্বরূপে পর্য্যায়ক্রমে পৌছায়, তেমনি সমাজ-জীবনেও বিভিন্ন সমূহের ভিতর দিয়া আপনার ব্যক্তিত্বের এক একটি দিক্ ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে সে বিশ্বজীবন উপলব্ধির প্রয়াসী।

সমূহ-তন্ত্র

সমাজক্ষেত্রে বিশ্ববস্তুর জ্ঞান ব্যক্তির নিকট সহজে ও সত্যভাবে পৌছিয়া দিবার জন্য, ব্যক্তির সহিত বিশ্বের বস্তুতন্ত্র যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হিন্দুসমাজপরিবার, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, গোত্র প্রভৃতি নানাবিধ সমূহ বা মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে। পরস্পরের সমবায়ে সমাজ-জীবনের পূর্ণতা সাধন ও ব্যক্তিত্বের চরম উন্নতি। ব্যক্তি সমাজের এক একটি সমূহের ভিতর দিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বন্ধনের ভিতর দিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করিতে করিতে শেষে বিশ্বজীবনে মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। আজকাল একটা অলীক বস্তুতন্ত্রহীন বিশ্বজনীনতার ধুয়া কেহ কেহ তুলিতেছেন;

তাঁহারা ব্যক্তি ও বিশ্বমানব দুইয়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ-বন্ধনের স্থান দেন না। বিশ্বজনীনতা একটা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক জিনিষ, তাহার অনুভূতি পরিবার, সমাজ, স্বজাতি ও সমূহবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; জ্ঞান ও কর্ম্মে পরিবার, গোষ্ঠী, স্বজাতি ও সমাজের সেবাতেই বিশ্বজীবনের জ্ঞান ক্রমবিকাশ লাভ করে। নচেৎ তাহা অলীক বস্তুতন্ত্রহীন।

জাতীয়তার একটা মিথ্যা আদর্শ আছে জানি। তাহার নাম Chauvinism, Jingoism, Imperialism. কিন্তু যাহা ইউরোপের বিশাল সমরক্ষেত্রে প্রলয়ঙ্করী মহাকালীর পদতলে কালসর্প হইয়া হলাহলে ভাসাইয়া দিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহাই মহাদেবের ব্যাঘ্রচর্ম্মে সুন্দর বন্ধনী। বিশ্বসভ্যতার নগ্নতাকে আবৃত করিয়া জাতীয়তা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, আর্ট, সমাজের আদর্শের কত না ভূষণ সুসজ্জিত করিয়া শিব ও সুন্দরকে জ্ঞান ও কর্ম্মের বন্ধনে নিত্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই দুঃসময়ে জাতীয়তার এই সত্য ও বাস্তব আদর্শ আমাদের যেন কিছুতেই ভুল না হয়।

ইউরো-আমেরিকার পরিবার-জীবনে যে প্রেমের আদর্শ দেখা গিয়াছে, তাহা নিতান্ত ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব এবং তাহা সমাজের খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তির ধ্রুব আদর্শ। সে প্রেমের তেমন গভীরতা নাই, ব্যাপকতা নাই। তাহার শুধু তীব্রতা আছে, উত্তেজনা আছে। সে প্রেম যুগলে আবদ্ধ, তাহা গভীর নহে; তাহাতে কালক্রমে অবসাদ ও নিরুদ্যম আসিবেই, তাহা নিত্য নূতন আনন্দ ও রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ নহে। গভীর প্রেম ক্রমশঃ যুগল হইতে সন্তান, সন্তান হইতে পরিবার, গোষ্ঠীবর্গ, সমূহ ও স্বজাতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকসিত হয় ও অসীমে প্রসার লাভ করে। তাহাতেই নরনারীর চরম সুখলাভ, যে প্রেম যুগলে আবদ্ধ তাহাতে নহে।

নারী-জীবনের চরিতার্থতা প্রিয়ার ভাবের চরমবিকাশেও হয় না। নারী মাতা হইয়াই আপনার জীবনের চরম আনন্দ অনুভব করিতে পারে।

হিন্দুর নারীশিক্ষা তাই মোহিনীর ভাবকে সংযত করিয়া জননীর ভাবকেই উৎসাহিত করিয়াছে। হিন্দু-বিধবা আমাদের গৃহে সেই মাতার ভাবের পূজারিণী, রোগের শুশ্রূষায়, পশু-পালনে, গৃহকর্ম্মে তিনিই সমাজের, নিখিল প্রাণীর, জগতের কল্যাণবিধায়িনী জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, রক্ষণাবেক্ষণ-কর্ত্রী জননী।

পরিবার-জীবন, গোষ্ঠী ও স্বজাতি-জীবন ব্যক্তিকে সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করাইয়া ক্রমশঃ বিশ্ববস্তুজ্ঞানলাভের অধিকার দেয়। জাতি, কুল, গোষ্ঠী, সমাজের ও সমূহের বন্ধন নদীর দুই তীরের মত ব্যক্তির জীবনস্রোতকে অনন্তের দিকে ধাবমান রাখে। এই সকল বন্ধন না থাকিলে ব্যক্তি তাহার জীবনস্রোতকে সঙ্কীর্ণ খাল, বিল, কূপের ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতায় হারাইয়া ফেলিত।

নারায়ণ-বিশ্ব-মানব-নর

সমাজের জ্ঞানে ও আদর্শে হিন্দু সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় না। আমাদের পুরাণ বলিয়াছেন,—সে কথা আগে বলিয়াছি, কিন্তু পুরাণের কথা অমৃত-সমান, বারবার বলিতেও ভাল লাগে, জগতের অসংখ্য জাতীয় জীব প্রথমে এক বিরাট্ পুরুষের গর্ভশায়ী ছিলেন। তাহার পর সেই এক বহু হইলেন। হিরণ্যগর্ভ বহুরূপে শরীরী হইলেন। তিনি বহু হইয়া অসংখ্যজাতীয় জীব হইলেন, তিনি বহু জীব-ব্যক্তিরূপে বিরাট্ শরীরে অভিব্যক্ত হইলেন। নিখিল জীবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। সমগ্র মানবজাতি তাঁহার বিরাট্ শরীর। নিখিল ব্যক্তি-মানবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। তিনি আপনাকে নারী ও পুরুষে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিরাট্কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বিরাটের সন্তান মনু এবং মনুই স্থাবর-জঙ্গমের স্রষ্টা। মনুর সন্তান আমরা জীবজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণেও বিভক্ত করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বর্ণের সমবায়ে, পরস্পরের জন্য ত্যাগে সমগ্র সমাজদেহের পূর্ণ পরিণতি।

এই বিশাল মানব-সমাজ নারায়ণের বিরাট্ শরীর। নারায়ণ দেশকাল-সীমাবদ্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড সমাজে, খণ্ড খণ্ড শ্রেণী, বর্ণ, সমূহ বা জাতিতে নিত্য অভিব্যক্ত। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক নরে তিনি নিত্য প্রতিভাত।

বৈষ্ণবী শক্তি, সৃষ্টি-স্থিতির শক্তি

প্রত্যেক জীব ও নরে, শ্রেণী ও সমাজের অন্তরে থাকিয়া নারায়ণ তাঁহার ব্যষ্টিপ্রকাশকে আপনার বিরাট্ বক্ষে নিরন্তর টানিয়া লইতেছেন। এই শক্তির নাম নারায়ণী, জীব ও সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতির শক্তি। উদ্ভিদ্জগতে বৃক্ষলতা-গুল্মের বীজ রক্ষার চেষ্টার নামই নারায়ণী। জীব ও মনুষ্যরাজ্যে বংশ বা জাতিরক্ষার চেষ্টাই নারায়ণী। জড়রাজ্যে তিনি যোগমায়া, আপনার ধ্যানে তিনি মহানিদ্রারূপে অবস্থিত। জীবরাজ্যে তিনি শক্তিরূপা, ক্রিয়ারূপা, জগৎ-প্রতিষ্ঠারূপা। তিনি প্রকৃতির নির্ব্বাচনী শক্তি, তাই জীবের নিকট কখনও তিনি অতিসৌম্যা লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদা, কখন অতিরুদ্রা রুধিরাপ্লুতা করালিনী। তাঁহার অলক্তরাগ-রঞ্জিত চরণের রেখা উদ্ভিদ্ ও জীবরাজ্যে অভিব্যক্তির কত না জয়পরাজয়ের কাহিনী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যরাজ্যে তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অসংখ্য জাতির কত না উত্থানপতনের ইতিহাস ধরাতলে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাসের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী। অক্ষম জীবের—মানবের বা জাতির বিনাশসাধন করিয়া তিনি কখন শবস্থা মুণ্ডমালিনী, আবার কখন বরাভয়করা অন্নপূর্ণা হইয়া তিনি সক্ষমকে অন্নদানে পোষণ, ভোগ্যবস্তু দানে পালন করেন। তাই সক্ষম সভ্য জাতি তাঁহার নিকট ত্রৈলোক্যের কল্যাণ প্রার্থনা করে—

সর্ব্বশক্তিবিনাশিনি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

অক্ষমের নিকট তিনি কালী, কপালিনী, চামুণ্ডা, সক্ষমের নিকট তিনি ভদ্রকালী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা। বসুন্ধরায় জীবের জীবনেতিহাসে সকল রূপ, জয়, যশ, সকল সৌভাগ্য ভগবতী সক্ষমকেই দান করেন। সক্ষমের এই নির্ব্বাচন ও পুরস্কার জগতের উপকারের জন্য, "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থম্", সকলের পাপদুঃখ আর্ত্তি নিবারণের জন্য, অক্ষমের প্রতি নির্য্যাতন-অত্যাচারের জন্য নহে।

নারায়ণই সমাজ। সমাজের স্থিতি ও বিকাশের শক্তিই নারায়ণী। তিনি শ্রদ্ধা—ন্যায় অন্যায় বুদ্ধি, আচার নিয়মের শাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমাজস্থিতির মূল। তিনি সমাজ-শক্তি ও রাষ্ট্র-শক্তি। তিনি লক্ষ্মী, ধন-সম্পদুৎপাদন-শক্তি। তিনি শাকম্ভরী—বসুন্ধরার আদি উৎপাদিকা শক্তি হইয়া জীবকে শাকান্নের দ্বারা পোষণ করেন। তিনি শোভা জগতের নিখিল সৌন্দর্য্যের আধারভূতা। তিনি কান্তি; মনুষ্যের ব্যবহারে, আহার-বিহারে, চারু শিল্পকলায় যাহা কিছু সুন্দর ও আনন্দের, তাহাই তিনি। নিখিল জ্ঞান, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা তিনিই। যুগলে তিনি আকর্ষণী শক্তি। সকল বৃত্তি, জাতি, বর্ণ, সমূহ তিনিই। তিনিই সর্ব্বজীবে চৈতন্য, বুদ্ধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপে থাকিয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। ক্ষান্তি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, বৃত্তি ও জাতিরূপে তিনি মনুষ্যের অন্তরে সবিকল্পক-জ্ঞান জাগাইয়া তাহাকে নানা সমূহে নানা সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন। তিনি শান্তি ও তুষ্টি হইয়া মনুষ্য ও সমাজের আদর্শ

সম্মুখে ধরেন, মনুষ্য সমাজ, সমূহ, জাতির প্রতিষ্ঠার কারণ-জ্ঞান অনুভূত করাইয়া স্মৃতি হইয়া অতীতকে সম্মুখে ধরিয়া তিনি ভবিষ্যৎ গঠন করেন।

জীবে মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশ

সর্ব্বভূতে শক্তিস্বরূপা হইয়া তিনি শক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। মাতৃস্বরূপা হইয়া তিনি সন্তানধর্ম্ম, পালনধর্ম্ম, ত্যাগধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবজগতে মাতৃত্বের বিকাশসাধনই জীবের বংশবৃদ্ধি ও উন্নতির মূল। মনুষ্য-সমাজে সেবাধর্ম্ম ও মাতৃধর্ম্মের বিকাশই উন্নতির মূল। বীজের জন্য বৃক্ষলতার ত্যাগে, জীবজগতে মাতার সন্তানপালনে, সন্তান, পরিবার, গোষ্ঠী ও স্বজাতির জন্য নরনারীর ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগে, ভবিষ্যৎ-সমাজ ও ভবিষ্যদ্বংশের জন্য বর্ত্তমান সমাজের আত্মোৎসর্গে আমরা সেই একই বিশ্বময়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। (ভিন্ন পথে আসিয়া আমরা এখানে বার্গসঁর সম্মুখীন হই)।

তাই হিন্দু জননীকে শক্তি অপেক্ষা মাতৃরূপে পূজা করিতে ভালবাসে। 'জননি জাগৃহি' ইহাই হইতেছে আবাহন মন্ত্র, শুধু শারীরিক সুপ্তি ও অবসাদ হইতে জাগরণ নহে,—যাহা কিছু জীবজগতে ও মনুষ্যজগতে evoluionএর বিরোধী,—সেই সকল বিঘ্ননিবারণে। মনুষ্যের অন্তরে মাতৃশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট্ মানবসমাজ পরার্থ কর্ম্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, মনুষ্যসমাজের ক্রমবিকাশ মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশে।

শুষ্ক তৃষিত জগতে মা আসছেন। তাপক্লিষ্ট পৃথিবী হবেন এবার বসুন্ধরা। উর্দ্ধব্যোম হইতে যে তার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মার দেহকান্তি যে রৌদ্রের কনকদীপ্তিতে দিক্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাতবিকম্পনে হরিদ্রাভ শস্যক্ষেত্রে যে মার স্বর্ণচেলি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। মেঘবিনির্ম্মুক্ত সুনীল আকাশে মার স্থির অচঞ্চল স্নেহদৃষ্টি ফুটিয়াছে। সরোবরে সরোবরে রক্তকুমুদে মার অলক্তরাগরঞ্জিত চরণের

রেখা পড়িয়াছে। প্রবাসী বাঙালী আজ ঘরে ফিরিতেছে, কত স্নেহ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া,—মানবের গভীর ও নিবিড় অনুভূতিতে মা যে জাগিয়াছেন। শরৎপ্রকৃতির নব নব রূপে, গন্ধে, বর্ণে, নবীন ধানে, নির্ম্মল আকাশে জ্যোৎস্নাহসিত রাত্রে, শেফালি পুষ্পে, শ্বেত শতদলে, চিত্তের আনন্দে, বিপুল সমারোহে তোমার বোধন। প্রকৃতির পরিপূর্ণতায়, অন্তরের পুলকে, কর্ম্মের আয়োজনে তুমি আমার দেশে, আমার গৃহে আসিয়াছ, জলে-স্থলে, ফুলে-ফলে, আকাশে বাতাসে আসিয়াছ, আমার অন্তরের আনন্দ উৎসবে তুমি আসিয়াছ। তুমি আজ নূতনের পুলকে পরিপূর্ণতায়ও আসিয়াছ। কিন্তু তুমি সনাতনী! আমার মত তুমিও নিত্যকালের ও কালের অতীত। আমার হৃৎ-কৈলাসে তুমি ভবানী হইয়া যে নিত্য বিরাজিত। তবুও বৎসর বৎসর আমি তোমার আগমনী গান গাহি, কারণ শরতের অমলজ্যোৎস্নারাত্রের নীরবতায়, অরুণ-কিরণোজ্জ্বল শিশির-সিক্ত প্রভাতে, শস্যক্ষেত্রের ঢেউখেলানিতে, শিউলি ফুলের ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে, আকাশে মেঘ ভেসে যাওয়ার মধ্যে কি যেন একটা ব্যাকুলতা আপনি জাগিয়া উঠে। আমার মন তখন তাহার সব দেনাপাওনা চুকাইয়া দিয়া আপনাকে ফিরে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই বৎসর বৎসর তোমার আগমনী গাহি, আমার আমাকে নূতন করিয়া ফিরে পাইবার সুযোগ পাই। আমাতে আর তোমাতে পূর্ব্বে এক ছিলাম, আত্মা ও দেহতে যেমন এক—আমাতে ও তোমাতে একাকার, কে আমি আর কে তুমি তখন বুঝা যাইত না, আর কেই বা বুঝিবে কাহাকে তখন? তখন ছিল কেবলমাত্র জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য—সবই গুণ কিন্তু কাহার জ্ঞান, কাহার প্রেম, কাহার সৌন্দর্য্য, কে বলিবে? সৃষ্টি তখন অসৃষ্টির কোলে নিদ্রিত। আমি তারপর জাগিলাম। আমারি সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, আমারি জ্ঞানে আনন্দলাভ করিলাম, আমারি প্রেমে বিভোর হইলাম। দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুইই আমি হইলাম।

তখন পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেমে বিভোর হয়েছিলাম। সে লীলায় আমি একা ছিলাম, তুমি ছিলে না। কিন্তু কি জানি কেন আবার আমার নূতন লীলা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি ছিলাম পূর্ণ, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণপ্রেমের মহিমায় গৌরবান্বিত, কিন্তু আবার আমাকেই পূর্ণভাবে অন্য প্রকারে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। অন্য দর্পণে আমার মুখ দেখিবার ইচ্ছা হইল।

আমারই ভিতর হইতে তোমাকে সৃষ্টি করিলাম। আমি তোমার ভিতর আমাকে খুঁজিতে লাগিলাম। সে অনাদি অনন্ত খোঁজার নামই সৃষ্টি। তোমাকে পাইবার জন্য এবার আমি আকাশ ও কালের সৃষ্টি করিলাম। আকাশ ও কাল তারা ত আমারই ব্যষ্টিবিকাশ। ক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি হইল। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের কত না বিচিত্র প্রকাশ দেখা গেল। আমি পূর্ণ ছিলাম, এবারও আমি আকাশে ও কালের ভিতর, রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-শব্দের ভিতর আমাকেই পূর্ণভাবে খুঁজিয়া পাইলাম, কিন্তু এবার তোমার মধ্যে। কারণ এই লীলার বিশেষত্ব তোমারি বিচিত্ররূপে আমার আমাকে পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়া। নূতন দর্পণে আমার আমাকেই চিনে লওয়া। আমি এবার বহু হইয়াছি, বহু হইয়া আমার বহুরূপীর সঙ্গে আমি লীলা করিতেছি। অনন্ত শূন্য আকাশে যখন আমি সৃষ্টির লীলাপদ্ম ফুটাইলাম, আর একটি পদ্মের পর্ণে পর্ণে এক একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচিত্রবর্ণে ফুটিয়া উঠিল, তখন সে বর্ণ সে জ্যোতির বিচিত্র ছটার মধ্যে আমি যে তোমারি রূপমাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমার সৌন্দর্য্য দেখিলাম।

যখন অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে আমি বর্ষ, মাস, দিবস, রজনী, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ সৃষ্টি করিলাম, তখন বর্ষা, শীত, বসন্ত, নিদাঘ ঋতুপরিবর্ত্তনের মধ্যে, প্রভাতের রক্তিমা ও সন্ধ্যার ধূসর আভার মধ্যে আমি তোমার বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম—কিন্তু সেও আমারই প্রতিরূপ।

খনিজ পদার্থ, মাটি, উদ্ভিদ্, জীব, মানুষ যখন পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ক্রমবিকাশের ধারায় উন্নতি লাভ করিতেছিল, তখনই এই ক্রমোন্নতি যে তোমারি উদ্দাম উল্লাসভরা গতি—জীবনপথে তুমি আমার নিকট উল্লাসে ছুটিয়া আসিতেছ, সে উল্লাস যে আমারি আনন্দ—সে পথ যে আমার আমাকে চিনিবার পথ। আবার মানব-সভ্যতার উত্থান-পতন তোমারই তালে তালে নৃত্য, যখন তুমি আর পথক্লান্ত পথিকের মত অগ্রসর হইতে চাহ না। সেই নৃত্য যে আমারি প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ের কম্পন। মানব-সমাজের বন্ধনী শক্তি যে তুমি ; পরিবার স্বজন, গোত্র, গোষ্ঠি, জাতির মূল বন্ধনী শক্তি তুমি। তুমি সকল বিদ্যা, সকল কলা, অর্থাগম ও সকল অভাব-পুরণের শক্তি। কারণ তুমি যে আমারই শক্তি। তুমি মানব-সমাজে সকল আচার-নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, নীচোচিত হীনকর্ম্ম-বিমুখ সজ্জনের হৃদয়ে তুমি লজ্জা, মানুষের আচার-ব্যবহারে যাহা কিছু মধুর ও আনন্দময় তাহা তুমি। কারণ তুমি যে আমারই শ্রী।

আমি নারায়ণ, তুমি লক্ষ্মী। আমি দেব, তুমি দেবী। আমি পিতা, তুমি মাতা—সকল জীবের মধ্যে আমরা দু'জনেই আছি। আমি যখন নির্জ্জীব হয়ে থাকি, তখন তুমি জীবের অন্তরে যোগমায়া হয়ে ঘুমাও। আমি যখন জাগি, তখন তুমি শক্তি হয়ে জীবকে উদ্বুদ্ধ কর। আমি জাগ্‌ছি, সঙ্গে সঙ্গে জীবও তোমায় মাতারূপে পূজা করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে যুদ্ধে পরাজিত করে, সিদ্ধিলাভ করে। গণেশ হন তখন তাঁহার সিদ্ধিদাতা, আর সরস্বতী ও লক্ষ্মী তাঁহার বিদ্যাসম্পদদাত্রী জননী। সে তখন বিশ্ববিজয়ী—কার্ত্তিক হন তাঁহার সেনানায়ক। ক্রমশঃ সে তোমাকে পায়, তোমাতে আর জীবে তখন প্রভেদ থাকে না। তুমি ও জীব একাকার হয়ে আমার নিকট আস। এরূপ কত যে জীব নিত্য আমার নিকট তুমি হয়ে আসে তার ঠিকঠিকানা নাই, আবার তুমি যে নিত্য কত অসংখ্যরূপ লয়ে আমার নিকট হতে দূরে খেলা করতে যাও তারও ঠিক-

ঠিকানা নাই। এই যাওয়া-আসার খেলাই হইতেছে সৃষ্টিলীলা, খেলা-ঘর হইতেছে শূন্য অনন্ত আকাশ, প্রাঙ্গন হইতেছে কাল, খেলোয়ার হইতেছি আমি আর আমার খেলী হইতেছ তুমি না হয় জীব, যখন যা আমার ইচ্ছা,—কখনও তুমি, কখনও জীব।

আমি খেলাঘর তৈয়ারী করিলাম। খেলীর সৃষ্টি করিলাম। আমার এ খেলার আদি-অন্ত নাই! আমার এ খেলা করিবার ব্যাকুলতায় দুরন্ত বাসনা কেন? কে আমার প্রাণে এ ইচ্ছা জাগাল? কেন এ ইচ্ছার এ রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে?

জ্ঞান বলিবে, সৃষ্টি মানেই জ্ঞানের বিস্তৃতি। আমার জ্ঞানের মহিমা সৃষ্টির অন্তরের ভাব। প্রেম বলিবে, সৃষ্টি মানে প্রেমের বিকাশ। আমার প্রেমের নিবিড় হইতে নিবিড়তর অনুভূতির স্তরে স্তরে বিশ্বের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য বলিবে, সৌন্দর্য্যের প্রকাশই সৃষ্টি। আনন্দ তখন জাগিয়া উঠিয়া বলিবে, আমি আমার প্রেম, আমার সৌন্দর্য্য, আমার জ্ঞান ফুটাইয়া তুলিতেই জগৎ সৃজন করিয়াছি। আমি যে অসীম অব্যক্ত। সৃষ্টির ভিতর দিয়া আমি আমাকে ব্যক্ত করিয়াছি, এবং আমাকে নিত্য নূতনভাবে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্য আমারি নিকট নিত্য নূতন প্রতিভাত। ইহাই হইতেছে সৃষ্টির আদিরহস্য।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্তকোটি জীবের অন্তরের ভিতর দিয়া আমার এই বিচিত্র অনুভূতি, আমার জ্ঞানের, প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের এই ইতিহাস ফুটিয়া না উঠিলে আমি প্রকৃত আনন্দ পাই না। কারণ, আমার প্রেমের তৃপ্তি, জ্ঞানের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের সম্ভোগ যে সকল জীবের উপভোগের ভিতর দিয়া। তাই মা যখন আসেন, গাছের পাতার শিহরণে, আলোর ঝলমলে, শেফালির গন্ধে, জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রের নীরবতায় ও কর্ম্মের বিপুল সমারোহে, আমি তখন আমাকে বুঝিয়া লইতে, চিনিয়া লইতে সুযোগ

পাই, আমি আমারই নিকট নিবিড় পরিচয়ের অনুভূতিতে ফিরিয়া আসি। কিন্তু আমার এই পুনরাগমন সম্পূর্ণ সার্থক হয় তখন, যখন জীবে জীবে মনুষ্য সমাজের অন্তরেও ঐ একই চিরন্তন আগমনীর গান জাগিয়া উঠে, সকলেরই বিপুল হর্ষের মধ্য দিয়া। আমার আত্মপরিচয়ের আনন্দ যে পূর্ণ হইবে না, সকল মনুষ্যের, সমাজের ও সভ্যতার আত্মপরিচয়ের আনন্দউৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত। তাই আগমনী চিরকালই চলিবে, যতদিন না সকল জীব, সকল মনুষ্য, সকল সমাজ ও সভ্যতার মুক্তি না হয়,—ততদিন আমারও আনন্দ নাই, মুক্তি নাই।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তির ধ্বংসলীলা

ত্যাগবিরহিতা শক্তির ধ্বংসলীলা। প্রচণ্ড কামনা ও শক্তির উন্মেষে শেষে শক্তিরই আত্মহত্যা। আজ ছিন্নমস্তার লীলা বিস্তৃত জগৎখণ্ডে প্রকাশিত। ধন, বিদ্যা জীবের পালনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনার স্বার্থ-সন্ধানে মত্ত হইয়া আত্মবিলোপ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আত্মঘাতী।

একটা প্রাচীন গৌরব-মণ্ডিত সভ্যতা আপনার যুগযুগান্তরে সঞ্চিত সমস্ত বেশভূষা অলঙ্কার, সমস্ত কান্তি ও সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া, নগ্না, কুৎসিতা হইয়া আপনারই হস্তস্থিত শাণিত তরবারে আপনাকে হত্যা করিল এবং আপনার রুধির আপনি পান করিয়া নিজ বিপরীত বুদ্ধি ডাকিনী-যোগিনীর সন্তোষ বিধান করিতে লাগিল। উন্মাদিনী তাহার পার্শ্বচারিণী ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে বিপরীত রণরঙ্গে নাচিতে নাচিতে তাহারই অগণ্য সন্তানের বক্ষের উপর উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। দিগ্‌দিগন্তের করুণ হাহাকার ও গভীর আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া সেই অট্টহাসি বিকট চীৎকার সমস্ত ভাসাইয়া দিল।

এসিয়ার বাণী

এই বিভীষিকাদর্শনে বিশ্বমানব আজ ত্রস্ত, ভীত, নির্ব্বাক, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। ভারতকে আজ বিশ্বমানবকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। বিশ্বমানবের দেহ আজ ছিন্নভিন্ন, অঙ্গ সমুদয় ইউরোপের সমরক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত। বিশ্ব-মানবের ছিন্ন অঙ্গ ও দীর্ঘ অস্থিকে সংযোজিত করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া ভারতমাতা আজ ত্রৈলোক্য-শুভদায়িনী—ভুবনেশ্বরী হইয়া বিশ্ব-মানবকে ক্রোড়ে তুলিবে, স্নেহাশিষ প্রদান করিবে।

বিশ্বমানব অমর। কত জীব, কত নর, কত সমাজ আসে যায়, কিন্তু বিশ্বমানব অমর। অস্ত্রে শস্ত্রে তাহার আঘাত, অগ্নিতে তাহার উত্তাপ লাগে সত্য; কিন্তু বিশ্বমানবের এমন একটা শক্তি আছে, যাহাতে তাহা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতমাতা বিশ্বমানবকে কত না প্রেম জ্ঞান ও ভক্তির কাহিনী শুনাইয়াছে। আজও, ভারতকে আবার অমৃতবাণী প্রচার করিতে হইবে। হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর, শক্তির পরিবর্ত্তে ত্যাগের। বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জ্ঞানের, বিচারের পরিবর্ত্তে ভক্তির। অতি-মানব বা অতি-জাতির গুণকীর্ত্তন নহে,—বিশ্বমানব বা বিশ্বজাতির, নরোত্তম ও নারায়ণের গুণকীর্ত্তন। সমগ্র জীব লইয়া তাহাদেরই চৈতন্যে নারায়ণের প্রকাশ। নরোত্তমের শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র নর, কীটানুকীট জীবও শক্তি লাভ করে। জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে এক বিরাট মানব-সমাজগঠন। সমগ্র জাতি লইয়া তাহাদের জাগ্রৎ-চৈতন্যে বিশ্বজাতি বা নারায়ণের প্রকাশ। জনক, গৌতম, বুদ্ধ, অশোক, শুক্রাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের ভারত এই বাণী দর্শনে বিজ্ঞানে প্রচার করিবে। শুধু জ্ঞানের রাজ্যে নহে, তাহার সমাজগঠন, রাষ্ট্র, শিল্পানুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও। সমাজতন্ত্রে, পরিবার, গোষ্ঠী, সমূহ স্বজাতির জীবনের ভিতর দিয়া সেই একই ত্যাগ ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইবে,

যাহা অন্তর্জ্জাতীয়ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি সমুদয়কে এক বিরাট্ মানবপরিবারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিরশান্তি ও চিরমৈত্রী আনিয়া দিবে।

যে সকল ভারতবাসীর ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্যবোধ ও গুরুদায়িত্ব অনুভব করুন, ক্ষণিকের ব্যর্থপ্রয়াসের জন্য অপবাদ ত্যাগ করিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই সত্যই আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিতর ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতির স্বধর্ম্ম রক্ষার সহায় হইবে, এবং স্বধর্ম্মের সহিত বিশ্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া একই সঙ্গে জাতির ও বিশ্বমানবের সেবা করিবার অধিকার দান করিবে।

সমূহজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়। কিন্তু আমার দেশ যে কৃষ্ণের সেরূপ সেবা করে নাই। কৃষ্ণ যে শুধু বৈকুণ্ঠের নারায়ণ বৃন্দাবনের বংশীধারী, ঘরের ঠাকুর নহে। সে শুধু রাখালের গোপাল, আমার খেলার সাথী ও দ্বারকার সিংহাসনে আমার ঐশ্বর্য্যবিভবের রাজা নহে। সে শুধু দরিদ্র নারায়ণ, আতুর নারায়ণ, দুঃখী নারায়ণ—আমাদের দ্বারে দ্বারে স্নেহ ও প্রেমভিখারী নহে। সে যে আমার সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক সমূহের আশ্রয় ও আধার। আমরা যে তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিভাবে খুঁজিয়াছি, তাঁকে যে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র মধুর সম্বন্ধের ভিতর দিয়া খুঁজিয়াছি। সমষ্টি-ভাবে তাহাকে যখন খুঁজিয়াছি, তখন সমূহের জ্ঞান আমরা হারাইয়া বসিয়াছিলাম। ব্যক্তিভাবে তিনি আমাদের জীবন বিচিত্র অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদনে তৃপ্ত করিয়াছেন। সমষ্টিভাবে তিনি আমাদিগকে সুমহৎ জ্ঞানানন্দে বিভোর করিয়াছেন। কিন্তু সমূহ ভাবে আমরা তাঁকে খুজিও নাই, পাইও নাই, সমাজের বিভিন্ন বিভাগ সমুদয়, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, গোপী মানবজাতির বিভিন্ন পরিবার-

রূপে সমাজ, ও সভ্যতা জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের নিকট এখনও ধরা দেন নাই। তাই আমরা বিশ্বজ্ঞান পাইয়াও কার্য্য কুশলতাহীন। সভ্যতার মণ্ডপে আমরা অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন মানব-সভ্যতার বিরাট ও চঞ্চল জীবনে আমরা ক্রিয়াহীন পুত্তলিকামাত্র। সমাজগঠন, সমূহ জ্ঞান আমাদের হয় নাই। সমূহ জ্ঞানলাভ এখন নূতন ভারতের একমাত্র সাধনা। ভগবানকে শুধু ব্যক্তিরূপে নহে, শুধু সমষ্টিরূপে নহে, সমূহরূপে পাওয়া চাই। কল্পনায় নহে, জ্ঞানে নহে, প্রত্যক্ষ ভাবে—তাঁকে সমূহরূপে পাইয়া সর্ব্বস্ব সেই সমূহের নিকট নিবেদন করা চাই। কে এই সাধনার পথ দেখাবেন, কে সিদ্ধি দান করিবেন? তিনি ছাড়া আর কেহ নহেন,—সেই নারায়ণী যিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রথম উদয়ে ভারতের সামগানমুখরিত বনভবনে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, অহং রাষ্ট্রী, সংগমনী বসূনাঞ্চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাং মা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্। নূতন ভারতের মন্ত্র ও দেবী, সাধনা স্বর্গ, অহং রাষ্ট্রী, সংগমনী বসূনাম। উপাসক, মন্ত্র ও বিগ্রহ যখন একাধারে মিশিয়া যাইবে, তখন আমার নিকট ভারত 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জগজ্জননী-রূপে মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিস্ফুট হইবেন।

নারায়ণের জড় দেহ

নারায়ণের জড় দেহ তখন ভারতবর্ষের মূর্ত্তিতে হিন্দুর নিকট ধরা দিবে। ভারতের বিচিত্র বর্ণ, জাতি, বিভাগ, সমূহ নারায়ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। কৃষক শিল্পী শ্রমজীবী বণিকগণের সমূহ নারায়ণের দশদিক প্রসারী হস্ত। দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্যমণ্ডলী তাঁহার মস্তক। রাষ্ট্র ও শিক্ষা বিভাগ তাঁহার মুখমণ্ডল। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও চারুশিল্পকলা তাঁহার দেহকান্তি। ভারতের সকল বর্ণ, সকল বিভাগ, সকল সমূহের

কর্ম্ম নারায়ণের বিরাট্ আত্মা। ভারতের বিচিত্র লোকসমূহ, গণ ও জাতির বিচিত্র কর্ম্ম নারায়ণী লীলা। সমূহ জ্ঞান ও সমূহ শক্তি তিনিই। সর্ব্ববৃত্তিতে সকল গণে থাকিয়া তিনি লোকসমূহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তী।" আবার জগতে সমগ্র জাতির জাগ্রত সমূহ জ্ঞানের প্রকাশে নারায়ণের বিরাট শরীর প্রতিভাত। প্রত্যেক জাতিতে যেমন সমূহ জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি ও বিস্তৃতির জন্য সকল শ্রেণী একই সমাজ-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত পরস্পরের সমবায়ে প্রত্যেকের এবং সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত থাকিবে, তেমনি সমগ্র মানব-জাতির বিরাট বিশ্বদেহে প্রত্যেক সভ্য সমাজ তাহার আত্মম্ভরিতা ও স্বৈরাচার ত্যাগ করিয়া পরস্পরের কল্যাণ সাধন ধর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সেই অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাসের সেবা করিবে।

সমূহের রসবিগ্রহ

হিন্দুর সমূহ চৈতন্যময় ও এই মাটির ভারতবর্ষ আমার নারায়ণের সুবিশাল অনুপম তনু। আমার মাটির মা কত না বিচিত্র সৌন্দর্য্যে দেবীরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করিতেছেন। গহনবিজন শ্বাপদসঙ্কুল চন্দ্রনাথশৃঙ্গে, তমালতালীবনরাজি সুশোভিত শেষশায়ী নারায়ণের সাগর-সৈকতে, জ্বালামুখীর অগ্ন্যুদ্গিরণকারী গিরিনিতম্বে অথবা বালার্ককিরণোদ্ভাসিত নির্ব্বাত স্থির পুষ্করসলিলে, অমরনাথ ও বদরি-নারায়ণের বিশাল ও বিপুল প্রসার ও গাম্ভীর্য্যে, সরযূ, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, অজয়ের স্নিগ্ধধূসর বা শ্যামল তটে, কঠোর তুষারশৃঙ্গে অথবা স্নিগ্ধশ্যামলবনানীতলে, সাগরবেলায় অথবা শুষ্ক মরুকান্তারে আমার সর্ব্ব-রূপময়ী মাকে আমি ভারতের বাহ্যপ্রকৃতির কত না বিচিত্র সুন্দর অথবা ভীষণ স্থানে পূজা করিয়া থাকি, বিভিন্ন তীর্থে তাঁহার কত না বিচিত্র শোভা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। সর্ব্বদেবময় যে জগৎ।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ।

অতোঽহং বিশ্বজগৎ তাং নমামি পরমেশ্বরীম্‌ ॥

তাই ঘোর অমানিশার নিবিড় সুষুপ্তিতে অথবা নির্ম্মল-জ্যোৎস্নাবিধৌত কোজাগর রজনীতে আমি মাকে কখন শ্যামা কখন লক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লই। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের বিরহবিধুর মন যখন দয়িতের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশী, তখন সুশীতল হিন্দোলে আমি সমগ্র বর্ষা প্রকৃতির সঙ্গে সেই নীলনবঘন মেঘবরণ-শ্যামসুন্দরকে লইয়া আমার সকল বিচ্ছেদ-বেদনা অবসান করি। নববসন্তের আম্রমুকুলগন্ধবাহী প্রথম দক্ষিণ সমীরণের সংস্পর্শে যখন চিত্ত মুগ্ধ ও উল্লসিত, তখন আমার গৃহে কাব্য-সঙ্গীতময়ীর আনন্দ বোধন। মধুমাসে আমার নবারুণ-রাগরঞ্জিত মত্ত হৃদয়ের দোলোৎসব। আবার গ্রীষ্মের প্রখর দীপ্তিতে দেবতাকে ও নিখিল প্রাণীকে আমার শীতল গন্ধবারি নিবেদন করিবার ব্রত, কত না স্নান চন্দন ও পুষ্পদোল যাত্রার উৎসবে আমি মার্ত্তণ্ডপ্রপীড়িত বুভুক্ষিত বসুদেবতার তৃষ্ণা ক্ষুধা দূর করি। হেমন্তে কনকবরণ ধান্য ও হরিদ্রাভ প্রকৃতির মধ্যে আমার অতসীপুষ্পবরণীর পূজা এবং দিগ্‌ব্যাপী নবীনধান্যশ্রেণীর অন্তরালে সুশ্যামল তৃণভূমিতে আমার রাখালরাজের গোষ্ঠবিহার। রাসপূর্ণিমায় অথবা দীপান্বিতা রজনীতে, আশিষঢালা মাতৃপ্রকৃতির শারদোৎসবে অথবা মত্ত মধুযামিনীর ফল্গুখেলায়, বিভিন্ন ঋতুর প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া দিবসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মধ্যাহ্নে অথবা সায়াহ্নে, অথবা কালাকালের কর্ত্তব্য অথবা প্রয়োজন সাপক্ষে আমি কত না বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ভাববিগ্রহে সেই বিশ্বাত্মক রূপকে খুঁজি ও পাইয়া থাকি—বিচিত্র রাগরাগিণীতে এক একটি রস জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে ঋতুপরিবর্ত্তনের ও দিবসের কালবিভাগের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াও আমার হৃদয়ে কত না বিভিন্ন রাগরাগিণীর ভাবমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলি। আমার সহজ, সরল, সতেজ জীবন যে বিচিত্র রসানুভূতির দ্বারা সেই এককে বহুমূর্ত্তিতে বিচিত্র দেখিবেই। তাহা না দেখিতে পাইলে

যে আমার সমষ্টিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র হইবে না, আমার রসানুভূতি ঘনীভূত হইবে না, আমার রসানন্দভোগ যে পরিপূর্ণ হইতেই পারে না।

এইবার আমার ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব, সেই বালগোপাল, সেই চিরকিশোর অথবা চিরকিশোরী, সেই জগদম্বা, সেই বৈকুণ্ঠের সম্রাট্,সেই জীবনমরণজয়ী বৈরাগী, সেই ক্ষেত্রপাল, বিশ্বকর্ম্মা, বাস্তুপুরুষ গৃহদেবতা, গ্রাম্যদেবতা, নগরলক্ষ্মী, কুলদেবতা অথবা কুলবিদ্যা, জাতি অথবা সাম্রাজ্যের দেবতা অথবা বিশ্বমানবের দেবতা তিনি কত না বিচিত্র মধুর সম্বন্ধে আমাদিগকে ব্যক্তিজীবন ও সমূহজীবনে আবদ্ধ রাখিয়া আমার নিষ্ঠা, ত্যাগ, প্রেম ও পালনধর্ম্মে ব্রতী করিবেন। পারিবারিক জীবনের মধুর ও প্রিয় সম্বন্ধগুলির ভিতর দিয়া যেমন আমরা নন্দদুলাল, চিরকিশোরী অথবা জগজ্জননীকে পাই, গৃহদেবতা গৃহলক্ষ্মী, ষষ্ঠীমাতা অথবা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া থাকি, তেমনি আমাদের নানাবিধ সমূহগণের অধ্যক্ষ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত বিচিত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবানের বিভূতি ও মাহাত্ম্য আমরা বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবে খুঁজিব ও অনুভব করিব। পরিপূর্ণ সমূহ-জ্ঞানের দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অনুভূতির চরিতার্থতা লাভ হয়, আর একদিকে তুরীয় ও সমষ্টিজ্ঞানও বস্তুতন্ত্রহীন না হইয়া বিগ্রহের রূপ গ্রহণ করিয়া পূর্ণ আনন্দ দান করিতে পারে। জাতীয় জাগরণের দিনে আজ ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ নহি, সমূহজ্ঞান ও সমূহশক্তির আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছি,—আর এই ক্রমোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তিত্বের এই বিস্তারের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে আমাদের ভগবদুপলব্ধিও শুধু ব্যক্তিগত জীবনের রসসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ না হইয়া সমূহ সমাজ ও সভ্যতা জীবনের উপকরণ হইতে নূতন নূতন রসবিগ্রহ উদ্ভাবন করিবে। হিন্দু-ধর্ম্ম চিরকালই গার্হস্থ্য জীবনকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া দেখিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবন এখন আর ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ নহে। সংসারজয়ী হইতে হইলে

আমাকে আজ সমাজ ও সভ্যতাজয়ী হইতে হইবে। তাই আজ আমার ক্রমবিকাশমান জিগীষু ব্যক্তিত্বসমূহ সমাজ ও সভ্যতাজীবনের নূতন দায়িত্ব বরণ করিয়া নূতন দ্বন্দ্বগুণ ও সম্বন্ধের অনুযায়ী নূতন ভাবমূর্তি খুঁজিতেছে।

সমূহ চৈতন্যময়ী

আমার অনন্ত বিশাল ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে, আমার ব্যক্তিগত জীবন, সমূহ-জীবন, সমাজজীবন সভ্যতাজীবনের অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে আমি কত না দশাবতার দশমহাবিদ্যার লীলা দেখিব, কত না আরও নূতন দেবতা নব-ভাব-বিভঙ্গিনী নবরাগরঙ্গিণী বিদ্যামূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে করিতে চলিব। মানুষের সে সৃষ্টির যে বিরাম নাই। মানুষ সে যে অনন্ত এবং প্রকৃতির লীলাও যে অনাদি অনন্ত। এই অনন্ত প্রকৃতি ও অনন্ত মানবজীবনের লীলার ক্রীড়নক একমাত্র সে-ই, যত দেব-দেবী সে-ই, যত লীলা খেলা, তার-ই। আমার তন্ত্র বলিয়াছেন, আমি দেব ও আমিই দেবী। সোঽহং ও সাহং। আমি শিব, আমি পরম জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ। আমি জীব, আমিই আমার সেই আনন্দের ভোক্তা। আমার তুরীয় জ্ঞান বস্তুতন্ত্রহীন থাকিবে, আমি প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিব, যদি আমার এই দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ ত্রিগুণাশ্রিত বাস্তবজীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ায়, আমার ব্যক্তিজীবনের, সমূহ সমাজ ও জাতি-জীবনের প্রত্যেক রসানুভূতিতে সেই একাত্মবোধ না আসে। ভারতবাসীর এই একাত্মবোধ এই বহুত্ববোধ চাই। তাহার নিকট এ বোধ সহজে আসিবে। ব্যক্তিগত জীবন, সমূহজীবন, সমাজ-জীবন, সভ্যতা-জীবনে ভারতবাসীর এই জাগ্রত বিশাল চৈতন্য চাই। তাহার পূর্ব্বে নারায়ণের প্রকৃত সেবা হইবে না নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে সকল নরই বঞ্চিত থাকিবে।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

হিন্দু ও দ্রাবিড়ী লৌকিক ধর্ম্ম

লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান

ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্মবোধ একের মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহুকে চিনিয়াছে তাহা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমাদের জনসাধারণের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনকে একটা বিশিষ্ট ছাঁচ দিয়াছে। বাহিরের পূজা অনুষ্ঠান যে ভাবের হউক না কেন, গ্রামের লোক, কৃষক বা শিল্পী রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, ভগবতী যাঁকে পূজা করুন না কেন, সে জানে যে ভগবান্ এক, তাঁর যে নামই দেওয়া হউক না কেন।

উত্তর ভারতে আমরা গ্রাম্য দেউলের মধ্যে সাধারণতঃ রাম লক্ষ্মণাদি, বিষ্ণুর অবতার, মহাদেব এবং বিভিন্ন শক্তিমূর্ত্তির পরিচয় পাই। তাহা ছাড়া আরও অনেক দেবতা আছেন যাঁদেরকে গ্রামবাসীরা পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। প্রত্যূষে যখন কৃষক তাহার শয়নকক্ষের চৌকাঠটি পার হইয়া দাঁড়ায়, বালার্কের প্রথম কিরণ যখন তাহার নিদ্রাজড়িত চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, তখন সে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া প্রার্থনা করে,—হে সূর্য্যদেব, তুমি আমায় সৎপথে রাখিও। যখন সে নদী অথবা পুষ্করিণীতে অবগাহন করে তখন তাঁহারই উদ্দেশে আবার সে অঞ্জলি দেয়। নদীও তাহার নিকট পূজার পাত্র। গঙ্গামাঈ, যমুনাজী তাহার কত পাপ গ্লানি ধুইয়া দিয়াছে। যখন সে শয্যা ত্যাগ করে তখন ভূমি স্পর্শ করিয়া সে ধরিত্রীমাতার নিকট প্রার্থনা করে, আমায় তুমি সন্তোষ দাও। যখন গাভী দুগ্ধবতী হইল, প্রথম দুগ্ধ সে বসুন্ধরাকেই অর্ঘ্য প্রদান করে, ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে কিছু সে ভূমি-দেবতাকে না দিয়া পারে না। লাঙ্গল দেওয়া ও বীজ বুনার পূর্ব্বে সে ভূমিকে এক হইলেও, প্রকৃতির

সেই ধারিণী ও জননীশক্তি, ভূমির সেই উর্ব্বরতা ও উৎপাদিকতা এবং ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব তাহাদের রস সঞ্চার করিলেও, ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা ও কল্পনার শাখা-প্রশাখা বিশ্বাকাশে অনন্তের দিকে বিচিত্রভাবে বিস্তার করিয়াছে এবং তাহাদের ফুল ফল মানবকল্পনার ও ভাবুকতার বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন এবং সৌন্দর্য্যে ও সুস্বাদুতায় মণ্ডিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানের এইখানেই দোষ ও ক্রটি—যে সে অনুষ্ঠানের মাপকাটি শুধু ইউরোপ ও জগতের অসভ্যজাতি সমুদায় হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। হইতে পারে আমাদের শক্তিপূজার ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বিভীষিকা ও আশ্চর্য্যবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক ইন্দ্রজাল ও যাদুগিরির সহিত সংযোগ ত্যাগ করিতে পারে নাই—কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাসে যেমন আমরা এক স্তর হইতে অপর উর্দ্ধস্তরে উঠিতে উঠিতে চলিয়াছি, অন্য দেশের শক্তি-পূজার ইতিহাসে এই অব্যাহতি গতি দেখা যায় না; এবং অন্য দেশের শক্তি-পূজার ব্যভিচার অথবা আমাদের দেশের সম্প্রদায়বিশেষের কদাচারকে লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিচার করিতে বসি তাহা হইলে বিচারটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক হইবে। মানুষের কোন অনুষ্ঠানকে বিচার করিতে হইলে তাহার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির দিকেই মন দিতে হইবে, বিকারের অন্বেষণ করিতে যাইয়া বিকাশের পথটি অনেক সময়েই হারাইয়া যায়। তখন সমাজ ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উদ্ভট কল্পনা ও বিচার সৃষ্টি হয়। সংস্কারকগণ এই ভুল অনেকবার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এটা ঠিক প্রকৃতি-পূজার নিম্নস্তরের ইন্দ্রজালের দিকটা ক্রমশঃ ছাড়িয়া, একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও দেবতার কল্পনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বেশ উচ্চস্তরে পৌছিয়া সত্য ও সরলভাবে ধর্ম্মপিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে।

এই গোড়াকার কথাটি মনে রাখিয়া যদি আমরা নিম্নস্তরের শক্তিপূজা আলোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের বিচারের ভুল না হইবার সম্ভাবনা। মুণ্ডা, ওরাঁওরা, সাঁওতালদিগের মধ্যে দেবী হইতেছেন, খের-মাতা, দেশাহাই দেবী, ভূমিদেবী, অথবা ভূ-দেবী। প্রকৃতির সেই নিগূঢ় রহস্যাত্মিকা উৎপাদিকাশক্তিকে মহীশূরের পর্ব্বতাঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ নবীন সবুজ ঘাসে কটিমাত্র আচ্ছাদিত হইয়া নৃত্যোৎসবে বৎসর বৎসর আবাহন করে। এই উৎপাদিকাশক্তির পূজা চিরন্তন, সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সেই অবিরাম জন্ম ও মৃত্যুর পর্য্যায়, সেই আপনার প্রহেলিকাময় শক্তি হইতে আপনার পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান নারীর জননীশক্তির সহিত জড়িত হইয়া কত যে লিঙ্গ ও মাতৃযোনির প্রতীক কল্পনা এবং মহনীয় সত্যানুভূতির আধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ;—গ্রীসের ডায়নোসিয়াস ও ডেমেটার আর্টেমিস বা ডায়না, আফ্রডাইটী, ভেনাস বা এথেনা, পারস্যদেশের অনাহিতা, ফিনিসিয়ার আষ্টার্টি এবং আসিরিয়া-ব্যাবিলনিয়ায় ইষ্টারের রহস্যাবৃত পূজানুষ্ঠানের শক্তি ও উন্মাদনা এইখানে এবং ইহারই শেষে যে স্থান ও যুগবিশেষে সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম ও নৈতিক সাধনার অঙ্গ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভূ-দেবী একটী ছোট গ্রাম অথবা ক্ষুদ্র জাতি-বংশের অধিষ্ঠাত্রী। দাক্ষিণাত্যে কালী বা মারীআম্মাও এই ধরণের, কিন্তু তাহাদের এমন কতকগুলি সার্ব্বজনীন গুণ আরোপ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদেরকে আর গ্রাম বা ক্ষুদ্র জাতি-বংশের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ যায় না। তবুও সেই গ্রামের বা অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ বা পুষ্প, নদীর বক্র অথবা আবর্ত্তগতি, উত্তরবাহিনী অথবা দক্ষিণবাহিনী স্রোত, কোন কুণ্ড অথবা ঝরণার সহিত ঐ গ্রাম্যদেবতা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদেরই বিশেষণে উহারা পরিচিত হয়। লোক-নায়িকা, কামমা, ঈষাকাই-আম্মা, দুর্গাম্মা, গঙ্গাম্মা, উজ্জম্মা, মাম্মিজাম্মা (আমগাছের দেবী), পুন্নাহারসুবাং মাই (নদীর ধারে পুন্নাই বনের দেবী),

তিরুভাল-উদাহরাল (বটবৃক্ষের দেবী) এদের প্রত্যেকের নাম ধাম প্রকৃতির কোন বিশিষ্টরূপ, নদী, বৃক্ষ, অথবা গ্রামবিশেষ বা কোন বস্তুর সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত এবং এইটাই, Naturalismর দিক্‌টাই আমার দক্ষিণ ভ্রমণের সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়াছে। প্রকৃতির সহিত এমন সতেজ ও জীবন্ত সম্বন্ধ ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এমন ভাবে দেবতার কল্পনা ও পূজাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই।

বিন্ধ্যগিরির অধিষ্ঠাত্রী বিন্ধ্যবাসিনী, কোলাবার পর্ব্বতগুহাবাসিনী সপ্তশ্রী কিংবা লেলিহানজিহ্বোসম্বলিত কাংগ্রার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখীর মত দাক্ষিণাত্যের দেবদেবী সমুদয়ই প্রকৃতিপূজার এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। কাঞ্জভরম ও মায়াভরমের আমগাছ, পাপনাশমের কালালতা এবং স্থান-বিশেষের বিবিধ বনৌষধি ও ফুলফলের সহিত দেবদেবীপূজার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রকৃতির পূজার এই দিক্‌টা চিরন্তন, কারণ মানুষ প্রকৃতিকে খণ্ডভাবে পাইতে অধিক ভালবাসে, প্রকৃতির সমগ্ররূপ অথবা অরূপ অপেক্ষা তাহার কোন একটি বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত অতীন্দ্রিয়বোধকে সে সহজেই মিলাইয়া দিতে পারে।

এই দিক্‌টা যেমন সত্য ও স্বাভাবিক, ইন্দ্রজাল, যাদুগিরি অথবা অনুকরণ-স্পৃহা হইতে উদ্ভূত প্রথা বা প্রক্রিয়াগুলি সেরূপ সত্য ও চিরন্তন নহে। হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতায় ইহা অপেক্ষা আর এমন গৌরবের বিষয় খুব কমই আছে যে, লৌকিকধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশে আমরা দেখিতে পাই, এই ঝুটাভাব ও ক্রিয়াকাণ্ডগুলা আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে এবং পূজা-পদ্ধতি ক্রমশঃ সত্য ও সবল দৃষ্টিতে সেই অসীমের পানে অসঙ্কোচে তাকাইতে চলিয়াছে।

আয়ানার হইতে হরিহরপুত্র, তামিল ও তেলুগুদিগের ভূত-প্রেতনিবারক

ভূতোত্তান হইতে ভূতনাথ, উত্তর ভারতের ভৈরোঁ হইতে কালভৈরব অথবা গোষ্ঠীর বা জাতিবংশের দেবতা সেনাপতি অথবা বিক্রুস্কন্দ হইতে সুব্রহ্মণ্য অথবা বোম্বাই অঞ্চলের বুনোদিগের খাণ্ডোবা হইতে জাতীয় খাণ্ডেবদেব শুধু দেবতার আরোহণ বুঝায় না, অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ডগুলারও অনুরূপ পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। হনুমান্ ও কালভৈরব মন্দিরের দ্বারপাল-ভাবে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইঁহারা বনজঙ্গল ছাড়িয়া দেবালয়ের মুক্তপ্রাঙ্গণে আসিয়া পৌছিয়াছেন মাত্র। শীতলামাতা অথবা লক্ষ্মীমাতা ঠিক এই ভাবেই আসিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। স্থানীয় বীর অথবা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া যাইতেছেন, ভূতদেব ভূতনাথে মিশিয়া যাইতেছেন, আবার ভূমিদেবী, গ্রাম্য-দেবতা, শীতলা, মারীমাতা অথবা রোগ ও মারীভয়ের দেবতা পার্ব্বতী ও দুর্গার অঞ্চলে আশ্রয় পাইয়া হিন্দুর দেব-সংসারে রক্ষা পাইতেছেন। গণেশ, যিনি দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে পরমাত্মাভাবে শিব ও হরি অপেক্ষা অধিক বরেণ্য, তিনি পূর্ব্বে অনার্য্যদিগের সূর্য্যদেব ছিলেন,—ত্রিবাঙ্কুরে মহাগণপতি হোমাগ্নি তাঁহার উদ্দেশ্যে এখনও প্রজ্বলিত হয়; গণাধিপ বা গণপতি হইতে বিনায়ক সহজ আরোহণ এবং মূষিক ও হস্তী অনার্য্যদিগের বংশ-নিদর্শনরূপে এখনও তাঁহার দেব-অঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে।

ইঁহাদিগকে তাহারা গড় হইয়া নমস্কার করে। যখন শস্য সংগৃহীত হইল, তখন গোবর অথবা তণ্ডুলের বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহার মাথায় ধানের ডাঁটা দিয়া দক্ষিণ ভারতে মাঠের মধ্যে শস্যের উপর রাখা হয়। ভূমিয়া হইতেছেন ভূমি-দেবতা, গ্রাম্য-দেবতা। গাভীর দুধ, বাগানের সে বৎসরের প্রথম ফল, কৃষকপত্নী তাঁহাকেই অর্পণ করে; প্রাঙ্গণটী ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পাঁচটী দুর্ব্বার শিকড় তুলিয়া গোবরে প্রত্যহ সজ্জিত করিয়া আসে। তাঁহারি বেউলে সে প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইয়া আসে। ক্ষেত্রপাল হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কীটপতঙ্গ হইতে শস্য ও ব্যাধি হইতে গোধন

রক্ষা করেন, এবং রাখালরাজ হইয়া রাখালগণের পূজা পান। কৃষকের সুখ দুঃখ, কৃষির উন্নতি অপরের সঙ্গে তিনি বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই পূজা-পার্ব্বণে আমোদ-প্রমোদে তিনি গোষ্ঠবিহার ও কালী-উৎসবের প্রধান সহচর। দেবতা এখানে সখা হইয়া কৃষকের অন্তরে আসিয়াছেন, সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধনে তিনি আবদ্ধ, তিনি এখানে প্রভু অথবা বিধাতারূপ সঙ্কুচিত করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের পল্লীগ্রামে শিব ও পার্ব্বতী, এবং তাঁহাদের পুত্র বিঘ্নেশ্বর ও সুব্রহ্মণ্য খুব মহাসমারোহে সব স্থানেই পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত দেবতা সেখানকার হইতেছেন আয়ানার বা শাস্তা। দ্রাবিড়ী জন্ম হইলেও তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দ্বারা হিন্দু হইয়াছেন। হিন্দুর দেবতাগণের পার্শ্বে তাঁহার স্থানলাভ হইয়াছে। দেবগণের বংশে আসিয়া, তাঁহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে হরিহরপুত্র। তাঁহার পিতা হইলেন শিব ও মাতা বিষ্ণু—যখন তিনি মোহিনীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুসময়ে বৃষ্টি আনেন এবং এটা খুব স্বাভাবিক ও উপযোগী যে, তাঁহার মন্দির প্রায় সর্ব্বদাই ঠিক একটা নদী, বিল বা খালের ধারে রহিয়াছে। তিনি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন এবং গভীর রাত্রে কুকুর, ঘোড়া বা হাতীতে চড়িয়া মাঠে মাঠে বা গ্রামপথে ঘুরিয়া পাহারা দেন। শস্যক্ষেত্র হইতে সমস্ত আধিব্যাধি বহিষ্কৃত করেন, লোকালয় চোর ডাকাত হইতে রক্ষা করেন। তানজোর, ট্রিচিনপলি, মদুরা, টিনেভেলি প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে যাইয়া আমি গ্রাম্য-মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির ঘোড়া ও হাতী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। গ্রামের কুমোর আয়ানারের এই সকল বাহন গড়ে এবং গ্রামবাসীরা কোন বিপদ্ উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সকল মানসিক করে। টিনেভেলি ও তানজোর জেলায় ও মালাবারে শাস্তাপূজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। কোচিনরাজ্যের ট্রিচুর সহরে আমি একটী ব্রাহ্মণসমূহ-মঠের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

শালগ্রামের পরিবর্ত্তে স্বর্ণবিগ্রহ শাস্তার পূজাসমারোহ দেখিয়াছিলাম। কুমারিকা যাইবার পথে দেখিয়াছি, আর এক গ্রামে টিনেভেলি হইতে প্রায় দশক্রোশ দূরে ব্রাহ্মণেরা চাঁদা তুলিয়া নিজেরাই রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া শাস্তার মন্দির তৈয়ার করিয়াছে। সেই স্থানটার নাম শেরু-মালিনপুগি। এই শাস্তাপূজা ব্রাহ্মণ-সভ্যতায় দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে একটা সতেজ জীবনী ও যোগ্যতাশক্তির পরিচায়ক। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা উত্তর ভারতের মত বিজয়ের গর্ব্বে ও আস্ফালনে যায় নাই, দ্রাবিড়ী সভ্যতা পরাজিত বা বিপর্য্যস্ত হয় নাই, ব্রাহ্মণ-সভ্যতায় চাটুবাদে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও নানা দিক্ হইতে দ্রাবিড়ী জনসাধারণের ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস হইতে পরিজাত পূজা ও অনুষ্ঠানের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই, এমন কি, শিব ও বিষ্ণুকে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রপল্লীগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী আম্মাভরু বা আঁঙ্কাম্মাকে তাঁহাদের গর্ভধারিণী জননী বলিয়া বরণ করিতে হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও দ্রাবিড়ী পূজা ও অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ আরও দেখা যায় আম্মা পূজায়। আম্মা অথবা মাতৃকার অসংখ্য মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। আম্মা-পূজা এবং উত্তর ভারতের দুর্গা ও কালীপূজায় তফাৎ এই যে, দাক্ষিণাত্যে শক্তি-পূজা ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে খুব নিম্নস্তরেরই পরিচয় দেয়, তাহাতে সূক্ষ্ম অসীমের ভাব ও অধ্যাত্ম-সাধনা অপেক্ষা ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও গ্রাম্যতাই বেশী। অথচ নাম অনেক সময় একই, ভদ্রকালী, মহিষমর্দ্দিনী, দ্রৌপদী, চামুণ্ডা, কালী-আম্মা ভগবতীর সহিত পরিচয় আমরা দাক্ষিণাত্যেও পাই।

মারী-আম্মা ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতা। তিনি বিসূচিকা এবং অন্যান্য মারীভয় হইতে গ্রামকে রক্ষা করেন, তাহা ছাড়া এমন রোগই নাই যাহা তিনি উপশম না করিতে পারেন, এমন কোন দান নাই যাহা তিনি না দিতে পারেন। ইঁহারাই হইলেন গ্রাম্য-দেবতা, ইঁহাদিগের

মন্দির গ্রামের একপ্রান্তে শস্তক্ষেত্রের মধ্যে ; উত্তর দিকে ইঁহাদিগের মুখ, কারণ সাধারণ বিশ্বাস হইতেছে—যত কিছু ব্যাধি উপদ্রব উত্তর দিক্ হইতেই আসে। হইতে পারে, ইহার কারণ উত্তর হইতে আর্য্যগণের উপনিবেশকে দ্রাবিড়ী সভ্যতা প্রথমে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। পূজা-পার্ব্বণে, আমোদ-প্রমোদে, রোগে দুর্দ্দিনে আম্মারাই গ্রাম্যসমাজে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় আকর্ষণ করে।

মারী-আম্মার পূজারীরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শূদ্র কিন্তু পূজা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণরাও সমবেত হন। অনাচারী কুম্ভকার ও ধোপারাই পূজার ভার লয়, মালা ও সাদিগারা বলিদান করে। দেবতাকে বাহনে অথবা রথে চড়াইয়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ-পাড়ায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-পাড়ায় শূদ্র নারিকেল ভাঙ্গিয়া অর্ঘ্য দেয় ও কর্পূরের আরতি করে। মারী-আম্মার পূজায় বলিদান, দেবতার সেবায় মদভোগ প্রভৃতি কদাচারের প্রভাব ব্রহ্মণ্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ কমিতেছে ; কিন্তু সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মণ্য-সভ্যতা অনার্য্যভাবসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসমান বলিয়া এখনও তাহার প্রভাব ততদূর বিস্তৃত হয় নাই। অনার্য্যদিগের বিবাহ অথবা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য অনেক স্থলে প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না এবং এই হেতু ব্রাহ্মণদিগের দেব-দেবীগণের রাজন্যবর্গ-প্রতিষ্ঠিত দু'চারিটা বড় বড় মন্দির থাকিলেও জন-সমাজে গ্রাম্যদেবতা, স্থানীয় আম্মা, বংশদেবতার পূজা লইয়া থাকে। হনুমান্ ও শিব অনার্য্য ও আর্য্যগণের ধর্ম্মসমুদ্রের সেতুবন্ধভাবে বিরাজ করিতেছেন।

দাক্ষিণাত্যে তানজোর জেলার অভ্যন্তরে যাইয়া আমি ব্রহ্মণ্যসভ্যতার আর এক চিত্র দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক গ্রামেই সেখানে শিব ও পেরুমলের (বিষ্ণু) মন্দির, নদীর ধারে ধারে স্নান-মণ্ডপম্, বালকগণ তালপাতায় লিখিত রঘুবংশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছে, প্রত্যূষে স্নানের

সময় বেদগানে সমস্ত গ্রামটি মুখর হইয়া উঠিতেছে, পূজা-পার্ব্বণে মন্দিরে ভজন হইতেছে, রোগ ও দুঃখের সময় সহস্রনাম-জপন অনুষ্ঠিত অথবা অথর্ব্ববেদ হইতে গান হইতেছে, তাহা ছাড়া হরিকথা, ভজনওয়ালা ও শাস্ত্রিগণ কথকতা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন, গ্রামবাসিগণ সীত্যাকল্যাণম্, দময়ন্তীকল্যাণম্ প্রভৃতি কালক্ষেপণ বা যাত্রা শুনিতেছে অথবা গ্রামপথের কাম-পাতিতে মদন-ভস্ম করিতেছে এবং সমস্ত গ্রামের পন্থ অথবা গ্রামপর্ণম্ হইতে তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে। ব্রহ্মণ্যসভ্যতার এই প্রতিপত্তির কারণ সম্ভবতঃ চোলরাজগণের প্রভাবে এ ক্ষেত্রে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু রূপান্তরিত করিতে পারে নাই।

দাক্ষিণাত্যের আম্মার এখনও মানুষ-দ্রোহিতা, পাশবিকতা ও বীভৎসতা যায় নাই। ইলাম্মা ও মারী-আম্মার পূজায় মেষবলি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎসভাবে করা হয়। আমি ট্রিচিনিপলি জেলার এক গ্রামে গিয়া শুনিলাম, যখন গ্রামে মড়ক উপস্থিত হয়, তখন পিড়ারীর (সংস্কৃত বিষহরির তামিল রূপান্তর) পূজা শেষ করিয়া গ্রামে তোটি (আমাদের এখানকার চামারের অনুযায়ী) উলঙ্গ হইয়া নাড়ীভুঁড়ীর মালা পরিয়া, মদ, চাল ও রক্তের ছিটা দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং অবশেষে গ্রামের একপ্রান্তে আসিয়া ভূত-প্রেতের উদ্দেশে ছুড়িয়া দেয়। ব্রহ্মণ্যসভ্যতার প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজাল ও যাদুগিরি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া শক্তির কল্যাণ ও করুণা মূর্ত্তিটি সমধিক পরিস্ফুট হইতে থাকে। গ্রামদেবতাদিগের স্নান ও পশুবলির প্রতি বিতৃষ্ণা ব্রহ্মণসভ্যতার প্রতিপত্তির উদাহরণ। বলিদানাদি অনুষ্ঠানেও দেবতাকে তুষ্টিকরণের পরিবর্ত্তে যজ্ঞোৎসবের দিক্‌টা অধিক ফুটিতে থাকে। তবুও গ্রামের শিব ও বিষ্ণুপূজা হইতে এই সকল গ্রাম্যদেবতার পূজা অনুষ্ঠানের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিব ও বিষ্ণু নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম শক্তির দ্যোতন করেন। ক্ষুদ্র গ্রামের গণ্ডীতে তাঁহারা গ্রাম্যদেবতাদিগের বেদ উপনিষদের মত আবদ্ধ নহেন। দাক্ষিণাত্যের

পার্ব্বতী, মীনাক্ষী, কামাক্ষী, কন্যা কুমারিকার সহিত আমাদেরও এই রকম প্রভেদ। সেই সাংখ্য ও বেদান্তের এই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর অনাদি অনন্ত লীলা, সেই স্রষ্টার ঐশীশক্তির কল্পনা মিশ্রিত হইয়া যে দুর্গা ও কালীর পূজা ও অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার ক্রমবিকাশ আরও অনেক উচ্চস্তরের। শক্তিপূজার এই ক্রমবিকাশ বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে বিভিন্ন পথে গিয়াছে। কিন্তু হিংসার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা, উৎপাত ও ভয়ের পরিবর্ত্তে বরাভয়, পাশবিকতার পরিবর্ত্তে দেবত্বের, অসুন্দর অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্যশ্রীর, বিরোধের পরিবর্ত্তে শান্তির রূপান্তরের ইতিহাস সকল দেশেই এক—সুতরাং কালী বা আম্মা, ইষ্টার, আষ্টাটী, আফ্রোডাইটী, সিবিলী কিংবা ডায়েনার পূজাপদ্ধতি ও ক্রিয়া-কাণ্ডের মূল শিকড়গুলা ঠিক এই ভাবেই গ্রীসের আদিমবাসীদিগের নদী, জঙ্গল, পর্ব্বত, ঝড়বৃষ্টির দেবতা আগন্তুকদিগের দেবতাদিগের অঙ্কে আশ্রয় পাইয়া টিকিয়া গিয়াছিল। জেভনায় জঙ্গলের শক্তি জিউস নাম লইল, আপলো ক্ষেত্রপাল মেষপালের সহিত একটু মিশিয়া গেল, আফ্রো-ডাইটী, হীরাও, এথেনী প্রত্যেকের পূজা অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোক-সাহিত্যের প্রভাবের গন্ধে বিচিত্র হইয়া উঠিল। স্থানবিশেষ বা লোক-সাহিত্যের প্রভাব অনুসারে দেবতাদিগের প্রভাব স্থির হইয়াছিল।

দেবদেবতার কল্পনা সৃষ্টি ও সংমিশ্রণ ভারতবর্ষ জুড়িয়া সেই বহু অতীত কাল হইতে চলিয়াছে ও চলিতেছে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতের কিয়দংশ যেমন ভূবিদ্যা অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মৃত্তিকা-ভিত্তি বলিয়া খ্যাত, কিন্তু তাহার উপর পলি পড়িয়া পড়িয়া যেমন স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে এবং গাছগাছড়া, বনজঙ্গল, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত-মালা, গ্রাম, সহর ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে, সেরূপ মানুষের স্বাভাবিক ভীতি কৌতূহল ও আশ্চর্য্যবোধের সেই বিরাট্ ভিত্তির উপর নানা ভাব, কল্পনা, দর্শনের স্তর পর পর উঠিয়া এক সর্ব্ববৃহৎ সর্ব্বতোমুখী,

সর্ব্বাধার হিন্দুত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। বেদের সেই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষৎ বেদান্তের সেই পরম এক ব্রহ্ম, মহাযান বুদ্ধতন্ত্রের তারা পুরাণের বিষ্ণু ও শিব ও অসংখ্য দেবদেবী, মুসলমানদের একেশ্বরবাদ ও পীর ফকির পূজা অথবা সুফীগণের প্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব, লিঙ্গ ও শালগ্রাম পূজা, গাছগাছড়া, পুতুল পাথর, জীব নদ নদী এত এই সজীব হিন্দুত্বে মিলিয়াছে ও মিশিয়াছে যে, ভারতীয় সভ্যতার ধারায় মত কোন একটার বিকাশ ও পরিণতি নির্ণয় করা অসাধ্য। আর এই মিশ্রণের সর্ব্বাপেক্ষা মূলতত্ত্ব এই যে, দ্রাবিড়ী বন-জঙ্গল, নদী, পর্ব্বত, ঘাট, মাঠে, গোষ্ঠী ও গ্রামের দেবতা ও বৈদিক দেবতা যে কখন পরস্পরের হাত ধরিয়া শেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে বা স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে দেখা গিয়াছে, তাহা অনধিগম্য।

তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানের অতি সুন্দর ক্ষেত্র এই ভারতভূমি, কারণ সভ্যতার নানা স্তরের সহিত এমন জীবন্ত পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

তুলনা-মূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনারও এমন ক্ষেত্র আর নাই। পাথর-পূজা হইতে ষট্চক্রভেদ, পশু-পূজা হইতে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান পর্য্যন্ত এমন বিচিত্র স্তরের বিচিত্র জাতি ও সভ্যতার ধর্ম্মানুষ্ঠান যে হিন্দুর লৌকিক ধর্ম্ম ও লোকাচারে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। একটী বিশিষ্ট সূত্রকে এই জটিল ও রঙীন আচ্ছাদনবস্ত্র হইতে টানিয়া বাহির করা ও তাহার বিশ্লেষণ করা তুলনা-মূলক ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কাজ। ধর্ম্মের এই আচ্ছাদন-বস্ত্রেরও দুইটী মূল সূত্র টানা ও পঁড়েন—প্রকৃতির সহিত বিরোধের পরিবর্ত্তে একটা জীবন্ত ঐক্যানুভূতি ও মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধ হইতে অনন্তবোধের রসানুভূতি। ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঐক্য এইখানে, তুরীয় বোধ ও সেই পরম একমেবাদ্বিতীয়ের জ্ঞান এই দুইটিকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে। আমাদের

এই 'নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল' ও 'অম্বরচুম্বিত-ভাল' হিমাচলদেশে,—'বহু স্যাম্‌' এই জ্ঞানটাও কেমন এই বিচিত্র মানুষ জাতি ও সভ্যতা-বাহুল্যের সহিত সুন্দর খাপ খাইয়াছে! কারণ এই 'বহু স্যাম্‌'-জ্ঞান বিরোধের পরিবর্ত্তে সামঞ্জস্য, বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে গ্রহণ, অনাদরের পরিবর্ত্তে মিশ্রণের উৎসাহ দিয়াছে।

দ্রাবিড়ী স্ত্রী-প্রধান সমাজে কুমারী ও মাতার যে বিশেষ সম্ভ্রম এবং তাহাদের যে বিশেষ পদ ও অধিকার, তাহাই এই কন্যকা-পূজায় প্রতিফলিত হইয়াছে। গোষ্ঠী বা কুলের প্রধান যেথানে নারী, এবং যেথানে বিবাহবন্ধনের অস্বীকার ও ব্যতিক্রমে নারীর মর্য্যাদাহানি হয় নাই, সেথানে উত্তর ভারতের জগদ্ধাত্রী, জগদম্বা বা গণেশজননী অপেক্ষা চিরকুমারী কন্যকা, গৌরী বা পার্ব্বতী পূজাই স্বাভাবিক। পুরুষ-প্রধান কুলে, সমাজে ও ধর্ম্মে মাতৃত্ব ও স্ত্রী-প্রধান সমাজে ও শাস্ত্রে নারীত্বের গৌরব। কুল, গোষ্ঠী ও সমাজের বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যে কুমারিকা-পূজা বিশিষ্ট পরিবার জীবন ও যৌবন-সম্বন্ধ ও আদর্শের আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা দাক্ষিণাত্যের কৃষকগণের—যেমন আম্মা শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বৈশ্যগণের সেরূপ কন্যকা। সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশে যাহা কিছু তাহাদের শুভ কর্ম্ম বা দান অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মশালা ও মন্দির-নির্ম্মাণ ও সংস্কার, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, মানমণ্ডপ বা পাণ্ডল (জলছত্র) বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং অন্যান্য প্রায় যাবতীয় দানানুষ্ঠানেরই যে গুরুভার এই বৈশ্যসমাজ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে—তাহা সবই কন্যকা কামাক্ষীর নামে উৎসর্গীকৃত। গ্রামে গ্রামে এই বিরাট্‌ বৈশ্যসমাজ নানা শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া স্বগোষ্ঠী জাতি ও সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য কন্যকা পরমেশ্বরীর নামে কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আজও চালাইতেছে, তাহা আমি ভারতীয় গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার সময় কিছু বলিব। কন্যকার উদ্ভব সম্বন্ধে দ্রাবিড়ী প্রবাদ

আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে একবার কোমাতি, (ইঁহারা হইতেছেন দাক্ষিণাত্যের বৈশ্যসম্প্রদায়) ও ম্লেচ্ছদিগের সহিত একবার ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। কোমাতিগণ পার্ব্বতীকে আবাহন করিলে তিনি কোমাতি-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ম্লেচ্ছরা ঐ কোমাতি-কন্যাকে বিবাহার্থে দাবী করায় যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাহারা একেবারে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু শত্রু-বিজয়ের পর কন্যার সতীত্ব সম্বন্ধে কোমাতিগণ সন্দেহ করাতে তিনি অগ্নি প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন। সেই হইতে কোমাতিগণ কন্যাকে পূজা করিতেছেন।

স্বর্গের দেবতাগণ সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যক্ষ-কিন্নরগণের প্রসাদ বিতরণের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু অসময়ে গভীর নিশীথে হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইল। হাতের মালা হাতেই রহিল, বিবাহ হইল না, কারণ মানুষের দৃষ্টিনিক্ষেপ দেবতাগণ সহ্য করিবেন না, দেবসভা ভঙ্গ হইল। লজ্জায়, ক্ষোভে মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। হৃদয়বল্লভের সহিত অনন্তকালের মিলনের পূর্ব্বেই চিরবিচ্ছেদ ঘটিল। বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে যিনি পরিত্যক্ত, তাঁহার নিদারুণ অবস্থা দর্শনে অমরবৃন্দের মুখে বিদ্রুপের কুটিল হাসি। তাই কুমারী ঘৃণায় ও ক্রোধে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিলেন।

তাই পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত রাজধানী অথবা পল্লীপথে—বৃক্ষান্তরালে অথবা জলাশয়পার্শ্বে—শস্যক্ষেত্রে অথবা গ্রামাভ্যন্তরে, যে স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি তন্তুবায় ও কর্ম্মকার ব্যস্ত—সেই সেই স্থানে, দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থানবিশেষে সেই অদ্বিতীয়ের বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন রকমে আমাদের ধর্ম্মের বহু শাখা-প্রশাখার মূল যে এক, তাহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে। উত্তরাংশের লোক যখন দক্ষিণে যাইয়া দেখে মহীশূর, তানজোর, তিনেভেলীর গ্রামে গ্রামে তাহারই চির-পরিচিতা ভদ্রকালী, ভগবতী, চামুণ্ডা কালী ও সপ্তমাতৃকামূর্ত্তি, তখন

তাহার কি বিস্ময়! পার্থক্য এই যে, উত্তরে আত্মা-শক্তির পূজা উপনিষদ্ আর বেদান্তের বিশুদ্ধভাবানুযায়ী পরিশুদ্ধ ও সংমার্জ্জিত, আর দক্ষিণে শক্তিপূজার দার্শনিক ভিত্তি তত সুদৃঢ় নহে এবং যন্ত্রতন্ত্রমন্ত্রের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যে শক্তিপূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির ভাব ও আদর্শে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং নিম্ন স্তরের যাদুগিরি ও ইন্দ্রজালের সংস্পর্শে দুষ্ট। কিন্তু, কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর কোনও আচার্য্য বা গুরু শক্তিপূজার বিশুদ্ধি ও বিকাশের আয়োজন করিবেন; এই ধর্ম্মবিপ্লব, কেবল আধ্যাত্মিক জগতে এক শুষ্ক আনুষ্ঠানিক ও স্মৃতিমূলক একেশ্বরবাদ হইতে প্রকৃতি ও জীবনের বহুমুখীনতার সম্যক্ জ্ঞানের পরিণতিতেই শেষ না হইয়া, কেবল দেবতার শোভাযাত্রার রথের, কৃত্রিম অনুষ্ঠানাদির ও তুচ্ছ বাদানুবাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধারেই সীমাবদ্ধ না হইয়া—ইহা সমাজবিপ্লবে পরিণত হইতে পারে। তাহাতে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি, সমাজের আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবলতর করিতে সাহায্য করিবে। ভারতের যাবতীয় জীবনে আচারের বৈচিত্র্যের মধ্যে ধর্ম্মের মূল যে এক, ইহাতে তাহাই সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে। মানুষের সহিত প্রকৃতির ঐক্যানুভূতি ও মানুষের সম্বন্ধ হইতে অনন্তবোধের রস সঞ্চারে যে কত উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারে, তাহাই কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়।

কুমারিকা অন্তরীপের দক্ষিণতম প্রদেশে, শিলাময় এক ক্ষুদ্রদ্বীপ—ঠিক যেন কুমারীর চরণযুগল এখনও মহাসাগর-সঙ্গমের দ্বারা প্রক্ষালিত। জনশ্রুতি এই যে, সাগরের বিস্তার হেতু, দেবীর শিলাময় দ্বীপে আদিনিবাস দুর্গম হওয়াতে তিনি অধুনা তীরস্থ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

এই স্থানে নীল-সিন্ধু-জলধৌত দেবীচরণে উপবিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃই উত্তরস্থ তুষারাবৃত হিমাচলের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধা পার্ব্বতীর কল্পনাচিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ভারতীয় মহাসমুদ্রের সতত-চূর্ণ-তরঙ্গমালা যে

অনন্তের সুর অবিরত জাগাইয়া রাখিতেছে—কুটিল প্রবাহিণী—সরযু, যমুনা, গোদাবরী ও কাবেরীর কলধ্বনিতে যে সুর সদাই জাগরূক, তাহাই আমাদের প্রকৃতির আহ্বান। চক্ষেও তাঁহার অনন্তের আলোক-দীপ্তি। দুর্গম পর্ব্বতকন্দরে, তালিরাজি-পরিবৃত সরোবরে, সাগর-বেলায় কিম্বা মরু-প্রান্তরে, যে যে স্থানে তাঁহার কমনীয়তা বা কঠোরতা কোন বিশেষ-রূপে প্রতিভাত—সেই সেই স্থানই আমাদের পবিত্র তীর্থভূমি। সীমার মধ্যে অসীমের যে অভিব্যক্তি, তাহারই বাণী নানাভাবে নানারূপে প্রকৃতি আমাদিগকে শুনাইতেছেন। তীর, সমুদ্র, উপত্যকার বিভিন্ন সৌন্দর্য্যে, স্থানীয় বহুবিধ মূর্ত্তিপূজায় প্রকৃতির এই বাণী ঘোষিত হইতেছে।

কুমারিকা অন্তরীপে গৌরীচরণচুম্বী-তীর-সংক্ষুব্ধ বীচিমালা, অনন্ত-প্রসারিত মহাসাগর, তিনেভেলী ও ত্রিবাঙ্কুরের শ্যামল বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র ও দিগন্তবিলীন অনুঘাট পর্ব্বতমালা দর্শনে দ্রাবিড়ীগণের মানসপটে কি এক অভিনব চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই প্রকৃতি উর্ব্বর গঙ্গাযমুনাতটের অন্নদাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা নহেন—তিনি পঞ্জাবের গিরিকান্তারে জ্বালামুখীর সংহারিণী নহেন—তাঁহার লেলিহান রসনা সংসারকে দাহন করে না—এই স্থানে তিনি কুমারী গৌরী কঠোর-তপশ্চারিণী—মহা সন্ন্যাসী মহাদেবের তুষ্টিসাধন-নিরতা।

প্রাচীন ভারতের উপনিবেশস্থাপনকারী দ্রাবিড়ীগণের কল্পনাশক্তি যেমন মনোহর, তাঁহাদের সত্যের উপলব্ধি তত গভীর। পরিজ্ঞাত ভারত-খণ্ডের এই দক্ষিণতম অংশে বসিয়া—নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাঁহারা এই স্মীর লীলায়িতভঙ্গী-বিভোরা—প্রবাল মুক্তাসার লইয়া খেলায় আত্মহারা এই চিরকুমারীর মূর্ত্তি রচনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এইস্থানে বিহার অপেক্ষা তপস্যার ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, কারণ দ্রাবিড়ী লোকপরম্পরায় কথিত আছে যে, গৌরীর এই পবিত্রক্ষেত্রে মহাদেবের সহিত শুভ-বিবাহের আয়োজন সব হইয়াছিল।

তাই বিবাহমন্দিরের 'গোপুরম্' এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাহার চারিটী স্তম্ভ অসমাপ্ত—কারুকার্য্যহীন—নির্জ্জনে অদূরে প্রেতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অমুদ্‌যাপিত ব্রতের করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কুমারীর অভিশাপে পিষ্টক ও পরমান্ন-পাত্র পাষাণে পরিণত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। আজও ভারতের শিল্পের প্রাসাদ অসম্পূর্ণ—আর বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে যে পাত্রে আমাদের মানস-নৈবেদ্যের পরিপাক হইত—তাহা পাষাণে পরিণত। অন্ন আজ বালুকাতে পরিণত—তাই সমুদ্রযাত্রিগণ, এখনও সাগরবারিতে বালুকার অঞ্জলি প্রদান করে—ইহাই বর্ত্তমান ভারতের বিশ্বমানব-সাগর অর্চ্চনায়—অর্ঘ্য ও নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে দীন বিনিময়। প্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে কুমারী যাত্রীদের এই দৃশ্য দেখিতে-ছেন—তাঁহার এই অন্তর-যাতনা পর্ব্বত-প্রতিঘাত হইয়া দিক্‌চক্রবালে ও সাগরকল্লোলে মিশিয়া গিয়াছে। আর্য্য, শক, হূণ, মঙ্গল, মোগল—কত নূতন জাতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতা আসিল, আবার বিলীন হইয়া গেল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্ত তিনি কি অমুদ্‌যাপিত ব্রতের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন?

কত দীর্ঘদিবস ও ক্লান্তিসুপ্তরজনী তিনি তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট শিবসুন্দরের নিমিত্ত রোদনে অতিবাহিত করিয়াছেন। কত বর্ষ—ব্রতসিদ্ধির আশায় করগণনা করিয়াছেন—তিনি নিশ্চিতই আসিবেন—আর কতদিন প্রিয়-তমাকে ভীষণবাত্যা ও তুফানসঙ্কুল এই পর্ব্বতসমাকীর্ণ সাগরবেলায় দুর্ভেদ্যবনরাজির অভ্যন্তরে নির্জ্জন নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করাইবেন? তিনি নিশ্চিতই আসিবেন।

নিশি সমাগমে যখন অতীত বিবাহনিশির সুখস্মরণে কুমারীর করুণ হৃদয় উদ্বেল উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন সমুদ্র সর্ব্বগ্রাসী হয়, প্রচণ্ড গর্জ্জন করিতে থাকে—তালিবনরাজি তখন বেদনায় শিহরিয়া মর্ম্মরিয়া উঠে। মানুষ তখন ভাবে, কুমারীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। শেষে যদি দেবী নিজকে সংযতা করিতে না পারিয়া সাগর-বারিতে প্রাণ দেন—এই ভয়ে ভীত

পুরোহিতবৃন্দ মন্দিরের সাগরমুখী পূর্ব্বদ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বহুকাল তিনি অপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন। আশা আর উন্মাদনা, হর্ষ আর সংযমের আবেশে—'তিনি নিশ্চিতই আসিবেন' এই চিন্তায় তবুও তিনি আপনাকে শান্ত করেন। তাই উদাস প্রভাতের ঈষৎ গৈরিক আলোকে লোহিত বেলাভূমির কষায়বস্ত্র-পরিহিতা, ধূসরপর্ব্বত-শ্রেণীর কেশরাজিযুক্তা, শান্ত সাগরবারির সাশ্রুনয়না, তপস্বিনীমূর্ত্তি। রাত্রির দুর্য্যোগের পর প্রভাতের শান্তি আসে, প্রভাতে দ্রাবিড়ীগণ তাঁহাকে পূজা করে তপস্বিনীমূর্ত্তিতে, মধ্যাহ্নে পূজা করে প্রকৃতির দীপ্ত ক্রমপরি-স্ফুটতার মধ্যে ঐশ্বর্য্যব্যসনে লিপ্ত ভোগমূর্ত্তিতে, সন্ধ্যার মোহন সমাগমে প্রকৃতির অলস আবেশের মধ্যে চম্পক-চন্দনের আকুল মিশ্রিত সৌরভে অভিসারিকামূর্ত্তিতে। আবার বিষাদময় গভীর নিশীথে যখন সমুদ্রের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তালিবন-শ্রেণীর নিঃসহায় হাহাকার ও ঘূর্ণীবায়ুর নিষ্ফল আস্ফালনের সহিত সুর মিলাইয়া একটা গভীর হতাশাব্যঞ্জক ঐক্যতান সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন চারিদিকের সেই প্রহেলিকার পর্ব্বতের মধ্যে ভক্ত পূজারীগণ কুমারীর উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যথানিপীড়িত মূর্ত্তির দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকে। দিনের পর দিন প্রকৃতির এই পর্য্যায়রূপে ভাববিবর্ত্তনে মানব-প্রেমের প্রতীক্ষা, মিলন ও বিরহের সেই চিরন্তন ছবি মানব-জীবনের সেই চিরন্তন tragedy প্রতিভাত। বিদ্রোহের পর যেমন সংযম আসে, নিশিবিচ্ছেদ যাতনার পর তাঁহার সংযম ও সাধনা। এ সাধনা কি চিরকালের? তাহা জানেন কেবল তাঁহার নির্দ্দয় প্রেমাস্পদ, যিনি কুমারীর সৌন্দর্য্যস্বপ্ন কালের ও ইতিবৃত্তের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতে নষ্ট করিয়াছেন—তিনিই ইহা জানেন।

ধনুষ্কোটী কন্যাকুমারিকা অপেক্ষা অধিকতর মনোরম। পুলকস্মৃতিময় সমরজয়গাথাপূর্ণ ধনুষ্কোটী আর এক রমণীর দীর্ঘ যাতনা ও শোকগাথা

স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতের মূর্তিমান্ শান্তি ও সদাচারব্রতপরায়ণ নৃপতি এইস্থানে বাণাঘাতে সাগরকে পরাজিত করেন—তাই এখানে সাগর সরোবরসম শান্ত এবং স্থির।

কিন্তু কন্যাকুমারী অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও উন্মাদক। এই অপূর্ণ-বাসনা আর হৃতধন দেশের পর্ব্বতশোভিত ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরবেলায়—তপ্ত বালুকা-রাশিবিদ্ধ ভগ্নমন্দিরাভ্যন্তরে এবং অসংখ্য তালিরাজিশাখাকৃত কর্কশধ্বনির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত। আশা যাহার বিঘ্ন, বিফলতা যাহার সম্বল—যাহার সান্ত্বনা কেবল নিরাশা—সে এইস্থানে আসুক, এই পরিত্যক্তা নিরাশাবিষপায়িনী—চিরকুমারীর—ফেনিলোচ্ছ্বাসধৌত চরণ-তলে ক্ষণিকের নিমিত্ত বিশ্রামনিদ্রা লাভ করুক,—তাহার ক্ষুব্ধোদ্দামবক্ষে আশ্রয় মাগিলে চিরশান্তি ও স্বকাম লাভ হইবে। কারণ যে ব্যক্তি—উত্তালতরঙ্গময় সাগরকল্লোল এবং উন্মত্তঝটিকামধ্যে আলুলায়িতকুন্তলা বিরহবিধুরা মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, আবার পরদিবস প্রাতে গৈরিকবসনাবৃতা কুমারীকে আর এক দিবসের তপস্যার নিমিত্ত—আর এক আশাধূসর সন্ধ্যা যাপনের নিমিত্ত—আর এক বিচ্ছেদবেদনাময় নিশিজাগরণের নিমিত্ত তপস্বিনীর বেশে দেখিবে, তাহার সকল নিরাশা দূরীভূত হইবে—এক অভিনব বিশ্বাসের এবং অভিনব সংযমের উদ্দীপনায় উদ্বেল আনন্দে।

যিনি সত্য শিবসুন্দর, তাঁহার সহিত আমার প্রকৃতির চিরমিলন যতদিন না হয়, ততদিন তাহারি মতন আমাদেরও কত অমাবস্যার বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে, হৃদয়ে ত্রিসমুদ্রতরঙ্গমালার ভাববিভঙ্গ ধারণ করিতে হইবে,—শুধু শিবসুন্দরের আশাপথ চাহিয়া। দেখিনা কি প্রকৃতিকে আমার প্রত্যেক সন্ধ্যায় কমনীয় নববধূর বেশে, প্রত্যেক গভীর রাত্রের অশান্তিতে অনুভব করি না কি তাঁহার অন্তঃকরণের মহাবিচ্ছেদবেদনাময় ত্রিসমুদ্রের মহাঝটিকাবিক্ষুব্ধ ভাবতরঙ্গ, আবার প্রত্যূষে তাঁহার কি শান্ত শ্রী, বালার্ককিরণোজ্জ্বলা হইয়া তিনি গায়ত্রী তীর্থে যখন স্নান করিতে

বসিয়াছেন, দিগন্ত বিস্তৃত রক্তবর্ণ বেলাভূমি তাঁহার কৌষের বস্ত্র হইয়াছে। তখন কি সংযম, কি কঠোরতা, কি পবিত্রতার দীপ্তি তাঁহার মুখে ফুটিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের অমাবস্যা রজনীতে ভারতীয় সভ্যতার চিরবিচ্ছেদ-বেদনায়, চাই আমাদের কুমারীর মত দিনে দিনে সংযম, দিনে দিনে কঠোরতা। কবে আমাদের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন হইবে তাহা আমাদের চিরকুমারী আর সেই চিরকঠোর শিবসুন্দরই জানেন।

প্রকৃতির প্রতিদান

ভারতের দেবদেবীর কল্পনা ও পূজার সহিত প্রকৃতির অবিরাম ভাব-বিপর্য্যয়ের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, আমি তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার নিগূঢ় রহস্যাত্মিকা উর্ব্বরা শক্তি, আপনার ভিতর হইতে আপনার পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের ক্ষমতা শীতঋতুর অবসাদ ও মৃত্যুর পর নব বসন্তে প্রকৃতির এই মৃত্যোত্থান শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কত ভূমিমাতৃকার পূজা আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষে যে মানব কল্পনা ও ভাবুকতার প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদ্যা দ্যোতনা ও মানব জীবনের অনন্ত লীলাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা শক্তিপূজার বিচিত্র ইতিহাস সকল দেশ ও কালে একবাক্যে সাক্ষ্য দেয়। আমি এখানে শক্তি পূজা অর্থে কোন বিশিষ্ট সগুণ দেবতার শক্তি বলিতেছি না, ব্যাপক ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের লীলাময়ী আদ্যা প্রকৃতির প্রতিদানকেই উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক দিবসের প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পর্য্যায়ও আহ্নিকের বিচিত্র মাতৃকল্পনা সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ পূজা অনুষ্ঠানে প্রকৃতিপূজার সাক্ষ্য দিতেছে।

দ্রাবিড় দেশে গ্রামের বড় রাস্তাটি সাধারণতঃ পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে গিয়াছে, সূর্য্যের রাস্তাকেই অনুসরণ করিয়াছে এবং দিবসের কালবিশেষে আকাশমার্গে সূর্য্যদেবের স্থান অনুসারেই গ্রামের পূর্ব্ব দরজায় ব্রহ্মার মন্দির, দক্ষিণ দরজায় বিষ্ণুর মন্দির এবং পশ্চিম দরজায় শিবের মন্দির। ইহাও খুব স্বাভাবিক যে যে দিকে সন্ধ্যার চিতা দিনের পর দিন জ্বলিয়া নদীর জলে তাহার করুণ প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে এবং দিক-বধূ তাহার দিকে ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে চাহিয়া থাকে সেইখানে সেই শ্মশানচারী শিবের মন্দিরের সম্মুখে গ্রামের শ্মশানটি পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামের কোথায়ও ঠিক মধ্যখানে দৈনিক স্নানের জন্য পুষ্করিণীটি রহিয়াছে, চারিদিকে পবিত্র দেবদারু, আম্র, চম্পক, নিম্ব অথবা নারিকেল শ্রেণী। দিনের পর দিন, প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে, বসন্তে, হেমন্তে ঐ শান্ত অচঞ্চল জলের উপর নীল আকাশের লীলাখেলা, গাছের মুকুল নবপত্রের স্নিগ্ধ অরুণিমা অথবা শুষ্ক পর্ণের ধূসর আভা প্রতিভাত হয়, কিংবা শিশু, বালক, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, যুবতী বা মাতা, মানুষের সকল বয়স ও অবস্থায় ভাববিপর্য্যয়ের ছায়া পড়ে! তখন শান্ত উদাস প্রভাতে অবগাহনস্নানে দেহ জুড়ায় এবং এই সব ছায়াদর্শনে মুগ্ধ হইয়া মন তাহার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন দর্পণে আস্তা প্রকৃতির অনাদ্যনন্ত চঞ্চল লীলাখেলা ও মানব জীবনের অনন্ত ভাববিপর্য্যয়ের কাল্পনিক ও বস্তুতন্ত্র প্রতীক ও মূর্ত্তি ফুটিতে থাকে। মানবীয় ও তুরীয় ভাবের আনন্দ বিনিময়ে সেইখানে সে মানুষের ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে রসানুভূতি পাইয়া যে মূর্ত্তির সহিত পরিচিত হয়, তাহারাই ঘাটের উপর মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ও অভ্যন্তরে তাহারই জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। চপলা প্রকৃতির ক্ষণিক খেলা কিম্বা মানুষের জীবন ও অদৃষ্টের সেই চিরন্তন বিবর্ত্তনশীল প্রতিরূপগুলাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনার জাল বুনা হইতে থাকে। কোথায়ও প্রকৃতির সেই আদি-উপকরণগুলা, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, পৃথ্বী প্রভৃতি বিগ্রহের রূপ ধরিয়াছেন। কারণ ইহারাও সেই পরম পুরুষের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি। কোথায়ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সগুণ হইয়া প্রকৃতি-কোটি হইতে ঈশ্বর-কোটিতে উপনীত হইয়াছেন। কোথাও মানুষের জীবনের অবস্থা ও পরিণতিকে মানুষের ও সমাজের জীবনের সম্বন্ধকে বিগ্রহ মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে। এই নিমিত্তই কোথায়ও বা চির-কিশোর বা চিরকুমারী, কোথায়ও বা সপ্তমাতৃকা, ব্রাহ্মী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, খোদিত মন্দিরগাত্রে ও মন্দিরদ্বারে জীবন ও মরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শান্ত ও

অনন্ত, মহাকাল বা মহাকালী হয়ত বা কোথাও এই লীলাময় দেব দেবীগণকে আপনার বিরাট ক্রোড়ে লইয়া আপনারই লীলায় বিভোর; একবার সকলকে তাহার শূন্যের কবলে গ্রাস করিতেছেন আর একবার শূন্য হইতে উৎসৃষ্ট করিয়া সৃষ্টিপ্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছেন। অন্তরাত্মা শেষে অনুভব করিবার সুযোগ পান। লীলাময় পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত জীবনের ও ভাবের অদ্বিতীয় কেন্দ্র হইয়া আপনিই প্রকৃতি ও সংসারের মায়াজাল ফেলিতেছেন এবং আপনিই আবার সেই জালকে উর্ণনাভের মত আপনার হিরণ্যগর্ভে সঙ্কুচিতও করিতেছেন।

কারণ, এইটাই ভারতের দেবদেবীর কল্পনা মন্দির নির্ম্মাণ ও সজ্জা-বিধানের অপরূপ কৌশল যে মানুষের মনকে একস্তর হইতে অপর উর্দ্ধস্তরে ক্রমশঃ লইয়া যাইবার একটা সুন্দর উপায় সে করিয়াছে। স্থানীয় লোক-সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্পের চিত্র মন্দির প্রবেশ করিতেই প্রথমে বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সজাগ করিতে থাকে। তান্‌জোরের বিখ্যাত মন্দিরের বাহিরের দালানে সেখানকার চলিত তামিল প্রবাদের অদ্ভুত মাছ, ঘোড়া, সিংহ, মানুষের গল্পের এমন আজগুবি ছবি আছে যে, আমরা আশ্চর্য্য হইলেও সেখানকার লোকের পক্ষে তাহা অতি শিক্ষাপ্রদ ও ভাবোন্মেষক। রামেশ্বরের সেই বিরাট দরদালানের ছাদে সমস্ত রামায়ণ মহাভারতটা ছবির আকারে এমন ফুটিয়াছে যে, যাত্রীর পক্ষে তাহা বাস্তবিকই অতি আনন্দের। কন্যা-কুমারিকা হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে শুচিন্দ্র মন্দিরের গোপুরমে রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি খোদিত রহিয়াছে। সেখানে সমুদ্র মন্থনের যে বিরাট ছবি কারুকার্য্যে মহনীয় ও মনোরম হইয়া রহিয়াছে তাহার তুলনা হয় এক বরবদুরের মন্দিরের অনুরূপ ছবির সঙ্গে। ভারতবর্ষের সকল মন্দিরে এমন কি গ্রাম্য দেউলে পর্য্যন্ত কম বেশী এইরূপ পুরাণের ছবি ও গল্প দেখা যায়।

মানুষের মন এইভাবে তৈয়ারী হইয়া যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে অনার্য্য-পূজিত-দেবতা হনুমান, কালভৈরব প্রভৃতি দ্বারপালগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চস্তরের দেবদেবী উপস্থিত হয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির সেই তিনটি রূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এবং তাঁহাদের সগুণ প্রকাশ বিষ্ণুর অবতার সমুদয়, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কিশোরলীলা, শিবের পঞ্চবিংশ লীলামূর্ত্তি। বিষ্ণুর অষ্টশক্তি, এইরূপে অন্তর্জগতে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বাস্তব হইতে তুরীয়তে ক্রমারোহণের মধ্যে যখন বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় লীলা, মানব জীবনের ভাগ্য ও যাবতীয় বিকাশ ও পরিণতির সহিত পরিচয় লাভ হইতেছে, তখন পূজার্থী মহামণ্ডপ, মুখমণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ ক্রমশঃ ছাড়িয়া, গর্ভগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। মন্দিরের চারিদিকের সমস্ত পবিত্রতা ঐ গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করিয়াছে; যেমন গর্ভগৃহে যিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন তিনিই সমস্ত দেবদেবী কল্পনার কেন্দ্রস্থল। দরদালানগুলার উচ্চতা ও প্রশস্ততা একদিকে যেমন অন্তঃকরণের প্রসারের সাহায্য করে, অপর দিকে সব পথগুলি যে একটা কেন্দ্রের দিকে ধাপের পর ধাপ উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ যে অল্পপরিসর হইয়া আসিতেছে, তাহাও অন্তঃকরণের সেই ঊর্দ্ধগতির সহায়ক, শেষে যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে আসিয়া পৌঁছিল তখন মন এমন একটা কম্পমান্ প্রতীক্ষার বিগলিত অবস্থায় আসিয়াছে যে সেখানে তাহার উপর যাহার ছাপ লাগিবে তাহা একেবারে স্থায়ী হইয়া যাইবে। বাহির হইতেও মন্দিরের সেই গোপুরমের পর হইতে অট্টালিকাগুলার ক্রমারোহণের দ্বারাও মন ধাপে ধাপে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ সেই ব্যোমের দিকে অগ্রসর হয়। আর ইহাও খুব আশ্চর্য্য নয় যে, সেই মন্দিরের গুহান্বিত মণিকোঠে নিঃসঙ্গভাবে পৌঁছাইয়া যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তিনি একবারে অরূপ। অসংখ্য মূর্ত্তি দেখিয়া ও পূজা করিয়া আসিয়া যাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, যিনি তাহাদের

প্রত্যেকের এবং সকলের মাঝখানে, তিনি বিশ্বরূপ এবং অরূপ; চিদামবরমের মত একটা মহাশূন্য, না হয় তানজোরের লিঙ্গের মত প্রকাণ্ড ও সীমাহীন, কিম্বা শ্রীরঙ্গম, কুম্ভকোণমের, ত্রিভেনড্রামের মত এমন বিরাট মূর্ত্তি যে সত্যই মনে হয় সে বিশ্বাধার, যে অরূপে বা বিশ্বরূপে সকলরূপ ও প্রকাশের জন্ম তাহার অতি সুন্দর দুর্জ্ঞেয় প্রতীক। তাহার মধ্যে যিনি এক এবং একের মধ্যে যিনি বহু, গ্রীক কল্পনার সেই উদ্ভিন্ন যৌবনের মহিমা ও কমনীয়তা যে বস্তুবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিচয় দিবার জন্য হিন্দু বা দ্রাবিড়ী শিল্প ব্যগ্র নহে; মানবজীবন ও প্রকৃতির অতীত সেই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য-লীলাকে উন্মোচন করাই ভারতীয় শিল্পের উদ্দেশ্য; এবং এই আদর্শে প্রাকৃতিক জীবন ও মানবের জীবন-মরণ খেলার মধ্যে যে সকল দৃশ্য-বস্তু বা ঘটনাবলীতে সেই তুরীয় রহস্য লীলাকে প্রকটিত দেখিতে পাই, সে গুলিই স্থপতি-বিদ্যা ও দেব-কল্পনার আশ্রয় ও আধার। এই নিমিত্ত কখনও উহারা রুদ্র, কখনও বিভৎস, কিন্তু সর্ব্বদাই উহারা বিশ্বাত্মক বিগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। এটা ঠিক প্রকৃতির কিম্বা মানবজীবনের সুষমা ও সৌসামঞ্জস্য জীবনের সবটা ঘিরিয়া বসে নাই। ভাঙ্গা গড়া অনিয়ম এমন কি বিশৃঙ্খলা জীবনের অনেক সত্য ও সৃষ্টি প্রকাশিত করে। দ্রাবিড়ী বা হিন্দু শিল্পের বিচার তাই গ্রীস হইতে আমদানী স্থপতিবিদ্যার মাপ কাটিতে হইবে না। জীবনের সমগ্রতা ও বাস্তব সত্যের মাপকাটির দ্বারা ইহার যাচাই হইবে।

এই দিক দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি, গ্রীক-শিল্প যেমন জীবনের এক দিকটাতে মূর্ত্তি দিয়াছে, সেরূপ মিসর, চীন, জাপান ও ভারত ইহারাও, যিনি অরূপ এবং যিনি বিরাট, তিনি মন্দিরের অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তির কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া রূপ-অরূপের লীলায় মগ্ন, তাঁহার চিরন্তন খেলা এমনই নিবিড় ভাবে দাক্ষিণাত্যের বিপুলকায় মন্দিরে ও মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ফুটিয়াছে যে, বলিতে হয় আর্য্যকল্পনা ও দ্রাবিড়ী

বস্তুবিদ্যা পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে জগতের এমন মহৎ ও সুবৃহৎ সৃষ্টি বোধহয় হইত না।

প্রকৃতির বিচিত্র ভাব, মানবজীবনের বিচিত্র পরিণতি, প্রেমের অফুরন্ত লীলার মধ্যে যিনি বিকারহীন, দ্বন্দ্বাতীত, শান্ত, অচঞ্চল তাঁহাকে ভারতবর্ষ অনুভব করিয়াছে; আর একদিক হইতে প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের লীলার মধ্যে তাঁহাকে বার মাসের তের পার্ব্বণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে বরণ করিয়া এবং জাতীয় জীবনের অতীত গৌরব-কাহিণীগুলাকে, মহাপুরুষ সমুদায়ের সার্থক জীবনের ঘটনাবলীকে প্রকৃতির পুনরুত্থান ও ষড়ঋতুর পুনরাগমনের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন ও রাম-নবমী, বলিরাজার রাখীবন্ধন, চাঁদ সওদাগরের পরিবারে মনসাপূজা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও বৃন্দাবনলীলা, প্রত্যেকে কোন হর্ষ দুঃখময় অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে অতীতটা আমাদের কাছে নিতান্ত নির্ব্বিকার, অস্পষ্ট কিন্তু তাহার অনুভূতি ও নিজ নিজ সাধন অনুসারে মানবজীবন ও সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন দিক উন্মোচন করিয়াছে। তাহার কোনওটি সত্য হইতে ভ্রষ্ট নহে, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ বিশিষ্ট ও বস্তুতন্ত্র সাধনা ও কল্পনায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইজিপ্টে বার্দ্ধক্যের সেই প্রশান্ত রহস্যে সকল শিল্প সৃষ্টি আবৃত ও স্তিমিত, চীনে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের ভিতর মানুষের জীবন যেন একটা দৃশ্যাভিনয়, জাপানে মানুষ প্রকৃতির খণ্ড-জীবন আপনার ব্যক্তিগত জীবনের চাঞ্চল্য হইতে রসাস্বাদন পাইয়াছে। কিন্তু গ্রীসের মত বিলাস, ভোগ বা যৌবনের মহিমা বা মানুষের বীরত্বকে অবলম্বন না করিয়া মানবভাগ্যের মধ্যে যাহা কঠোর অথবা নিষ্ঠুর তাহাকে ছন্দে আবদ্ধ করিয়া ঘর-সংসারেও আনিয়া আয়ত্ব করিয়াছে। ভারতবর্ষে একদিকে একটা তুরীয়-বোধ সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধানে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই আবেষ্টনে ঘিরিয়াছে। আবার অন্যদিকে

অরূপের রূপবাসনাকে অবলম্বন করিয়া অরূপকে বহুরূপী সাজাইয়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মানব-ইতিহাসের গতির মধ্যে তাহার নিত্য নব অভিনয় দেখিতেছে।

এই আদর্শই ভারতবর্ষের আত্মা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য ও পর্য্যাপ্তি এই আদর্শকে একটা বিশিষ্ট ছাঁদ দিয়াছে। সকল কল্পনা ও সকল সৃষ্টিকেই বিচিত্র ও অসংখ্য করিয়াছে, কালের ধারণায় সেই মন্বন্তর যুগ-যুগান্তর কল্পনা, জগতের ধারণায় সেই চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি দেবদেবীর ধারণায় তেত্রিশ (কোটি?) দেবতা কল্পনা মন্দির নির্ম্মাণে সীমাহীন বিস্তৃতি ও বিশ্রাম মণ্ডপে বনানীর ন্যায় সহস্রাধিক কারু স্তম্ভ নির্ম্মাণ স্থপতিবিদ্যা, কারুকার্য্যেও পুলক বর্ত্তমানকালে সজাগ হইয়া নানা পূজা অনুষ্ঠানের আনন্দ সৃষ্টি করিতে থাকে। আমরা যেন পুনর্ব্বার সেই অতীতের হর্ষ ও দুঃখ বর্ত্তমানে ফিরিয়া পাইয়া আবহমান কালের অব্যাহগতি মানবজীবন ধারার ঐক্য সূত্রটিকে খুঁজিয়া পাই। ভারতবর্ষের কল্পনায় ইতিহাসের ঘটনা ঋতুর সঙ্গে বিবর্ত্তনশীল, এবং বিবর্ত্তনটাও পৌনঃপুনিকভাবে চলিয়াছে। তাই আমরা নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তি গড়িয়া বা ছবি আঁকিয়া স্মৃতিরক্ষা করি না। প্রকৃতির বিচিত্রবর্ণের লেখা পঞ্জিকায় এক একটি মহাপুরুষের জীবন অমর হইয়া রহিয়াছে; তাই মেলায়, শোভাযাত্রায়, আমরা যে শুধু তাঁহাকে বা তাঁহার কোন লীলাকে স্মরণ করি তাহা নহে, অনেক সময়ে সেই সব লীলা আমরা অভিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনে পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাই। উত্তর ভারতের রামলীলা, রাবণলীলা, ভরতমেলা প্রভৃতি অভিনয় যে রামায়ণ অপেক্ষা রাম লক্ষ্মণাদিকে জনসমাজের অন্তরের আরও নিকটে নিবিড়ভাবে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। অভিনয় ও প্রতিরূপের সাহায্য এবং ঋতু-পরিবর্ত্তনের চিত্রণে সমগ্র মানবজীবন ও অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কন, ইতিহাসের কল্পনায় মানবের যুগের

পর যুগের বিবর্ত্তন—এই সকলের ভিতরেই একটা tropical temperamentএর (গ্রীষ্মপ্রধানদেশীয় চিত্তের অপর্য্যাপ্তি) প্রভাব দেখিতে পাই।

দাক্ষিণাত্যের দেবদেবীগণের যে লীলা বৎসর বৎসর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও এই ধরণের। মন্দিরের ভৃত্যদিগকে জমি দেওয়া আছে; তাহারা প্রতিবৎসর অভিনয় করিয়া থাকে; এবং মত্নরার মন্দিরের একটি সুন্দর নিয়ম যে, মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের উৎসবমূর্ত্তি প্রত্যেক মাসে নগরের এক একটি স্বতন্ত্র পথ দিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হয়, ভক্ত পূজারী গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই মত্নরার পথসকল মাসিক শোভাযাত্রা হইতে এক একটি মাসের নামে অভিহিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা অথবা লীলা এইরূপে এক একটি অধ্যাত্ম ও অলৌকিক ভাবকে আশ্রয় করিয়া পথে ও প্রাঙ্গনে ব্যক্তির অনুভূতির রস প্রাচুর্য্য ও জনতার জাগ্রৎ চৈতন্য হইতে নবজীবন লাভ করে, এবং অফুরন্ত যুগ পরম্পরাগত মানব জীবন ও বিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে যিনি লীলাময় তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করাইয়া দেয়।

আবার ইহাই প্রকৃতিকে নিত্য নবমূর্ত্তি দিয়া ও অতীতকে বহু ও বিচিত্রভাবে ধারণ করিয়া আমাদের বার মাসের তের পার্ব্বণ পূজার অসংখ্য ক্রিয়াকলাপে অভিবক্ত হইয়াছে; অথচ এই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে যিনি এক, তাঁহাকে ভারতবর্ষ হারায় নাই। এইরূপে এক একটি ভাব ও ঘটনা বস্তুতন্ত্র হইয়া জাতীয় ব্যক্তির চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে।

বৎসরের পর বৎসর ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত; চন্দ্রের গতির অনুযায়ী এবং গ্রহযোগ বিশেষে আমাদের নানারূপ পূজা পার্ব্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন সূর্য্যদেব মাথার উপর হইতে প্রখর রৌদ্র বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্লান্ত পান্থদিগের জন্য জলছত্র মণ্ডপ এবং সরাই প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই ধর্ম্মবোধ যে মানবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে, যাবতীয়

পশু পক্ষী ও বৃক্ষ গুল্মাদি জলসিঞ্চিত হইয়া এই করুণার অংশ পাইয়া থাকে। এবং স্থানীয় দেবদেবীগণও তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ দাবী করেন। বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতুতেই বিষ্ণুর স্নানাদি অনুষ্ঠান অতীব স্বাভাবিক। বট, অশ্বথ ও তুলসীবৃক্ষের উপর এবং শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার উপরে ছিদ্রযুক্ত পূর্ণ-জল-কলস স্থাপিত হয় এবং বিন্দু বিন্দু জলকণা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও তাঁহাদের শীতল করিয়া রাখে। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পূর্ব্বপুরুষদিগের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে সুস্বাদু ফল-সম্ভার-সজ্জিত পূর্ণ-জল-কলস দ্বারা তর্পণ করা হয়। বিহারে এই সময় কৃষিজীবিগণের দেবতার তুষ্টি-সাধক নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে, রমণীগণের বহুপ্রকার গীত ও ছড়ার আবৃত্তিতে এবং মৌলবীগণের প্রার্থনায়, বর্ষার প্রতীক্ষায় ব্যাকুলতার একটা সহজ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষার সূচনায় যখন নদনদীর কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ভরা সৌন্দর্য্য ও আকুল প্লাবন তাহাদিগের পূর্ণ যৌবনের পরিচয় দেয়, তখন গঙ্গাপূজা, মকরবাহিণী হইয়া গঙ্গামাতা ঘাটে ঘাটে ফুল-ফল-অর্ঘ্য পাইয়া সমুদ্রের দিকে কুলু কুলু হাস্যে অগ্রসর হন। ঠিক অনুরূপ অনুষ্ঠান দাক্ষিণাত্যের কাবেরী স্নান। আদি মাসের অষ্টাদশ দিবসে যখন কাবেরীর জলরাশি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠিয়াছে তখনই কাবেরী-স্নান; যেখানে নদী আবর্ত্তগতি অথবা কোন শাখানদী আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানে কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া স্নানোৎসবে যোগ দেয়। যখন ভরা আকাশের গুরু গুরু গর্জ্জন কৃষকের আনন্দ কোলাহলের সহিত মিশিয়া যায়, আর অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্য দিয়া ধরণী গগনের মধ্যে এক অব্যক্ত বিরাট সহানুভূতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে; তখন মানব হৃদয়েও প্রিয়তমের সহিত একটা মিলনেচ্ছা স্বভাবতঃই জাগরূক হয়, প্রতীক্ষা ও বিরহ রঙীন হইয়া উঠে; আর এই সমস্ত অভিনব ভাবই যেন তৎকালীন ঝুলন যাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; নব শোভায় হাস্যময় কদম্বের শাখায় দোদুল্যমান ঝুলনের উপর, প্রাণ আকুল

করা সৌরভের মধ্যে, প্রিয়ার সহিত প্রিয়তমের মিলন, দীর্ঘবিচ্ছেদের পর রাধিকার সহিত রাখাল বালকের মোহন লীলা, মানবাত্মার সহিত ব্যথিত ভগবানের যোগ। শ্রাবণের মনসা পূজা সেই সময়ে সর্পভীতির অধিকতম সম্ভাবনাকেই নির্দ্দেশ করে। তাহার পরেই নন্দোৎসব; নয়নাভিরাম শ্যামল তৃণে যখন সমস্ত ভূমিই মণ্ডিত হইয়া যায়, তখন নববস্ত্র পরিহিত উৎফুল্ল রাখালবৃন্দ গাভীগণকে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেয় এবং বংশীধারী রাখাল নন্দের দুলালকে আহ্বান করিয়া হর্ষে নৃত্য ও ক্রীড়া করে। এই সময়ে অম্বুবাচীও বর্ষার সূচনা করে। বারিপাতে যখন পৃথিবী রসযুক্তা হইয়া বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার উপযোগী হন, তখন তিনি হন রজস্বলা, অশুদ্ধা, তখন ভূমিকর্ষণও নিষিদ্ধ।

পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলে বৃষ্টির বিরামে যখন সমুদ্র আর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নয়, তখন আগামী বৎসরের শুভ সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যকল্পে সমুদ্রকে নারিকেল অর্ঘ্য দান এবং নৌকা সমুদ্রতরী প্রভৃতিকে পূজা করা হয়। ভাদ্রের শেষ সময়ে চাষীগণ 'ভাদোই' ফসলের জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এবং ভবিষ্যতেও এবংবিধ অনুগ্রহের আশায় অনন্তব্রতের উপবাসে আত্মসংযম করিয়া থাকে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে বর্ষণের উপর 'অঘ্রানী' ফসল এবং রবিশস্যের উপযোগী অবস্থা সম্যক নির্ভর করে বলিয়াই এই সময়ে কৃষকেরা নানারূপ ব্রত ও তর্পণ দ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের তুষ্টি সাধনে তৎপর হয়। অতঃপর নবরাত্র বা নয়দিবস ধরিয়া সংযম অভ্যাস এবং বিষুব সংক্রান্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই শুক্লপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিতে আমাদের অতসী পুষ্পবরণীর পূজা; হেমন্তের ধান্য ও প্রকৃতির হরিদ্রাভা তাঁহার সোণার অঙ্গে উথলিয়া পড়িয়াছে। কৃষকের নিকটও এটি একটী মহৎ উৎসব, কারণ এই পূজা উর্ব্বরতার অবিনশ্বরত্ব ও ধরণীর প্রচুর দানের পুনঃসম্ভাবনার জ্ঞাপক। উৎপন্ন নবীন ফসলের অনুযায়ী ও মহা সমারোহে প্রতিমার

পূজা সাধিত হয়। দক্ষিণে দশহরার দশম দিবসে খুব আনন্দ ও উৎসব। সেই সময় সেখানে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং আয়ুধ পূজার লাঙ্গল, খুরপী হইতে সমস্ত শিল্পের যন্ত্রাদি চন্দনে চর্চ্চিত হয়। হেমন্তে মালাবারের ওর্ণম উৎসব সর্ব্বপ্রধান—শস্য সঞ্চয়ের সহিত বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিবাঙ্কুরে আলিপনার দ্বারা ভদ্রকালীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হয়, বালিকা ও যুবতীগণ মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া গান রচনা করে, গাহে ও পথে পথে যাইয়া নৃত্য করে। কার্ত্তিক মাসে ধানের শীষ গজাইবার সময় বহু প্রকার পূজার অনুষ্ঠান হয়, বিশেষতঃ রমণীগণ ও কুমারী বালিকারা নানারূপ ব্রতের উদযাপন করে। মাসের শেষ অংশে ধান্য ফসলের আশু সম্ভাবনায় যখন মনে চাঞ্চল্যের আতিশয্য হয় তখন সকলেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সংযম অভ্যাস করে; এই সময়েই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুদিনব্যাপী উপবাস ব্রত। দীপালি উৎসবে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং নদীর স্রোতেও প্রদীপ ভাসান হয়; বঙ্গদেশে আবার শ্রী ও সমৃদ্ধির দেবতা লক্ষ্মীর পূজা কোজাগর পূর্ণিমা তিথিতে সাধিত হয়। তাহার পর শরতের অতুলনীয় পূর্ণিমা রজনীতে রাসযাত্রায় গোপীগণের সহিত রাধাকৃষ্ণের নৃত্যলীলা প্রকৃতি জগতের পর্য্যায়রূপে স্ফুরণ ও বিকাশের অব্যাহত শক্তির সহিত প্রাণী জগতের যে বাস্তবিকই একটা সাম্য আছে, তাহাই ঘোষণা করে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, প্রলয় নৃত্য-ভঙ্গীতেও ভয়ঙ্কর গূঢ় রহস্যে আবৃত শ্যামামূর্ত্তির পূজা।

৩০ শে কার্ত্তিক কৃষক তাহার ক্ষেত্র হইতে একটী পক্ক ধান্যপূর্ণ শীষ আহরণ করিয়া পুরোহিতকে দিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত না তাহার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় ততক্ষণ ফসল কাটা একেবারে নিষিদ্ধ। ফসল ঘরে তোলার পর অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসব চাষীদিগকে মাতাইয়া তোলে; হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাসে যে তাহারা অন্ন দ্বারা প্রথমে মূক পশুপক্ষী এবং তৎপরে আত্মীয় কুটুম্বের এবং সকলের শেষে আপনাদের পরিতৃপ্তির প্রতি

লক্ষ্য রাখে, এইটাই তাহাদের ঔদার্য্য ও সরলতার পরিচায়ক ; তাহাদের প্রতি উৎসবে তাহাদের মানসিক সৌন্দর্য্য এইরূপেই আত্মসংযমের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। সেই দিনই গ্রামে গ্রামে নবীন কার্ত্তিকের পূজা, কার্ত্তিক মূলে যুদ্ধ দেবতা হইলেও কালের স্রোতে তাঁহার সহিত অগণ্য নূতনত্ব ও সৌন্দর্য্যের স্মৃতি ও প্রসঙ্গ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণে পিঠা সংক্রান্তি কর্ম্মক্লান্ত কৃষকের সারা বৎসরের গ্লানি স্নেহের হস্তে মুছাইয়া দেয়, স্নেহময়ী মাতা কর্ম্মাবসানে পুরস্কার প্রত্যাশী সন্তানগণকে সুমিষ্ট পিষ্টক দ্বারা আপ্যায়িত করেন—এইটাই কৃষকদিগের অবিমিশ্রিত আমোদের সময়।

বাংলার মকর সংক্রান্তির উৎসবের দিনে দক্ষিণে পঙ্গল উৎসব। পঙ্গল নামে ফোটা, এবং দিনের অনুষ্ঠানটি হইতেছে দুগ্ধে গুড়ের সহিত নূতন চাউল রান্না করিয়া বিশ্বেশ্বরকে উৎসর্গ করা। পঙ্গলের দ্বিতীয় দিনে গোমহিষাদি স্নাত, ও পূজিত হয় এবং অনেক গ্রামের ষণ্ড লইয়া ক্রীড়া আমোদ হয়। তামিল বৎসর আরম্ভ এই পঙ্গল উৎসবে। কৃষির গৌরবকে আশ্রয় করিয়া এই আনন্দ-দিন হইতে কৃষকের বৎসর সূচনা। তামিল পূজা অনুষ্ঠানে সেরূপ পারম্পর্য্য লক্ষিত হয় না, শুধু শস্য সঞ্চয়ের সময় মাবী আম্মার বিপুল সমারোহে পূজা গ্রামে গ্রামে হইয়া থাকে।

বসন্তের প্রথম সংস্পর্শে যখন দক্ষিণ বায়ু নব আম্র মুকুল গন্ধভার বাহী, যখন যবশস্য নবীন ও সবুজ, বনে বনে নবঘন শ্যামলতার ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে তখন সরস্বতী বোধন প্রকৃতির পুনরুত্থানের হর্ষগীতি ও সৌন্দর্য্য চারু শিল্পকলা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী ভারতীর পূজা। পঞ্জাবে লোকেরা তখন হরিদ্রা ও সবুজ রঙের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত ভোজন আলাপে সন্ধ্যা কাটায়—লোড়ী উৎসবের আমোদ প্রমোদ বাস্তবিকই প্রকৃতির নূতন জীবনের সুরে আত্মহারা। পূর্ণ বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে যখন ধরণী ভাববিহ্বল, যখন অশোক কর্ণিকার বনে বনে রক্তরাগের ঢেউ তুলিয়াছে পশুপক্ষীর অন্তরে আবেগের

বিলাসাতিশয্য তখন কৃষির বিরামের পর হোলি উৎসবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্য জগতের Saturnalia মত হোলি উৎসব প্রকৃতির সেই আত্মা পুনরুত্থান শক্তির উদ্বোধন। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরের বাসনা তখন রক্তিম হইয়া ফাগুণের দোল খেলার ফাগ বৃষ্টিতে ঘাটে বাটে ঘরে প্রাঙ্গনে আপনার পরিচয় দিতেছে।

ষড়ঋতুর শোভাযাত্রা, গ্রহতারকা রবিচন্দ্রের আকাশ পথে পৌনঃপুনিক বিবর্ত্তনের সহিত হিন্দুর আমোদ উৎসব একটা নিবিড় সংযোগ রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের বিচিত্র ভাব ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত, এই সব বাৎসরিক পূজা পার্ব্বণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করা হয়, এবং একই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট পূজা বা অনুষ্ঠানের একটা লৌকিক আর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এটা ঠিক মানুষ এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই বারুণী, অর্দ্ধোদয়, চূড়ামণিযোগ, চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণ বা পূর্ণিমা গঙ্গাস্নানে, অমাবস্যার মাসিক বাৎসরিক ব্রত অনুষ্ঠানে এবং পূজা উৎসবে বার মাসের তের পার্ব্বণে এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির ঘূর্ণায়মান ব্রহ্মাণ্ড-স্রোত ও ষড়ঋতুর চিরন্তনী লীলার সহিত একটা নিবিড় সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে।

আর এই বিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে যিনি লীলাময়, তাঁহাকে ভারতবর্ষ অ-মানুষ অপ্রাকৃত ভাবে দেখিয়াছে।

গ্রীক কল্পনা দেব দেবীগণকে মানুষের ছাঁদে গড়িয়াছিল, মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রতীক, ঋতু পরিবর্ত্তনের বিচিত্র ছবি হইতেই গ্রীক শিল্প তাহার পূর্ণ বিকাশের সময় রঙ্‌ বা সৌন্দর্য্যের মাল মসলা গ্রহণ করে নাই। গ্রীক শিল্প ও পুরাণ মানুষের মধ্যেই অসীমের সন্ধান করিয়াছে। গ্রীসে ঝরণা বা নদী, মাঠ অথবা কুঞ্জের nymph অথবা বধূগণ গোড়া হইতেই একেবারে মানবীয় এবং ঘর ও পরিবার জীবনের সহিত তাহাদিগের

নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রকৃতিকে গ্রীক কল্পনা সজীব ও জীবন্ত ভাবে অনুভব করিয়াছে এটা ঠিক। কিন্তু তাহা মানবীয় কল্পনা হিন্দুর কল্পনার মত অপ্রাকৃত নহে। গ্রীকের কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা আছে কিন্তু তাহার কেন্দ্র মানুষ ও মানুষের ভাব ও আদর্শ, হিন্দুর কল্পনা মানুষকে প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতের ক্রোড়ে রাখিয়াছে। গ্রীসের Horai অথবা ঋতুর দেবতা প্রকৃতির বিবর্ত্তনের সঙ্গে নব নব রূপ ধারণ করে না, তাহারা স্বাধীন তাহারা কাল্পনিক নৃত্যগীতশীল সদাই Graces-দিগের সহচর। এই ঋতুর দেবতা সমূহের সহিত আমাদের ষড় ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে বিচিত্র নিত্যনব প্রকৃতি পূজার আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রকৃতির খণ্ডরূপ ফুল ফল গাছ পালার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ আমরা লোকালয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের আমোদোৎসবের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিয়াছি। আমাদের মাঙ্গলিক সমুদায়ই একটা আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যবোধ ও প্রকৃতির অনুভূতির সাক্ষ্য দিতেছে। চন্দন ও সিন্দুর চর্চ্চিত মঙ্গল কলসটির উপর মুকুল সম্বলিত আম্রশাখা ও ক্ষীণকটি কদলী বৃক্ষটি রাখা হয় এবং বেল ও নারিকেল কত না শুভ ফলের দ্যোতনা করে. স্ফুটনোন্মুখ নারীত্বের যৌবন গরিমার নিদর্শন সিন্দুর সধবার চিহ্ন এবং প্রসাধন বিলাস উপকরণ চন্দন কুঙ্কুম অলক্ত কস্তুরি পান সুপারী সবই আমাদের মাঙ্গলিক। শুভ শঙ্খ বলয় সিন্দুর ও স্বর্ণ সম্বলিত সিন্দুর চুপড়িটী গৃহলক্ষ্মীর পূজার মাঙ্গলিক এবং পূজার ঘরের সম্মুখে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ তণ্ডুল হরিদ্রা চূর্ণে কত না লতাপাতা, পদ্ম, মাছ, আলিপনা দেয়। দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রদেশে, মালাবারে এবং তামিল প্রদেশে গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথটি বাঙ্গালীকে অত্যন্ত দ্বিধাভরে অতিক্রম করিতে হয়, কারণ নারীর এমন নিপুণ হস্তে রাস্তার উপর শাদা লাল ও হলদে রঙের সরল ও চক্র রেখার সমাবেশ, পদ্ম, লতাপাতার বৃত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে যে তাহাদিগকে অবমাননা করিতে ইচ্ছা যায় না। মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোরের অথবা গ্রামের প্যারিচারী পঞ্চমদিগের বাসস্থানেও আমি প্রায়ই এইরূপ গোময় প্রলেপ ও

সুন্দর কারুকলা কৌশলে আল্পিনা দেওয়া দেখিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্যের অতি অপরিচ্ছন্ন ঘরের বাহিরে একটা সৌন্দর্য্য বোধের উদ্দীপনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কেবল দৈনিক উৎসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত নহে, মানুষের জীবন ও তাহার পরিণতির সুন্দর প্রতীক এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্যামায়মান সমতল ভূমির বট কিম্বা অশ্বথ ত একটা গাছ মাত্র নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আবার কত নবীন বংশধর জড়াইয়া রহিয়াছে; অতীতের সাক্ষ্য তাহারা কয়েক পুরুষের গাছবংশ, তাহাদের সুশীতল ক্রোড়ে মাস মাস বৎসর বৎসর, পঞ্চায়ৎ গ্রামের সুখ দুঃখের আলোচনা এবং বালকগণ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া আসিয়াছে; মানুষের ভাগ্যের উপর তাহাদের কি স্নেহ করুণ ছায়াস্পর্শ; পর্ব্বতের বাত্যাহত চির নবীন দেবদারুগুলা পর্ব্বতের মতনই কষ্ট সহিষ্ণু, সাগরবেলার তমালতালী যাহারা প্রতিনিয়ত নির্ম্মল ঊষার প্রথন সূর্য্যরশ্মির ও প্রতি সন্ধ্যায় করুণ সূর্য্যাস্তের সহিত পরিচয় পায়, ইহারা সবই আমাদের চিত্রকলা, আমাদের গৃহ-সজ্জা, আমাদের লোক সাহিত্যে আদরের স্থান পাইয়া লোক চৈতন্যের উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। আবার শুধু এই জগতের মানুষের সুখ দুঃখের সংকীর্ণ গণ্ডী অথবা প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে আবদ্ধ নহে। হিন্দুর কল্পনা এই বাহিরের সাধারণ জিনিষ, দৈনিক সচরাচর যাহা দেখি বা শুনি তাহাদেরকে আশ্রয় করিয়া একটা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের রহস্যরাজ্য ও তুরীয় রসানুভূতির নিগূঢ় মাধুরী অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া শঙ্খের আবর্ত্ত চিহ্নটি (spiral) ক্রমারোহণের প্রতীক হইয়া খুব আদরের হইয়াছে—। বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই spiral গতিকে জৈবিক ও মানবীয় বিবর্ত্তনের ধারা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। হিন্দুর যোগমার্গে জীবের ঊর্দ্ধ গতির ব্যাখ্যা শঙ্খের আবর্ত্তকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছিল।

সাগরবেলায় নিক্ষিপ্ত শশিশুভ্রশঙ্খ যুদ্ধে রথী মহারথীর হস্তে ভীষণ নিনাদে পূর্ব্বে ধরাতল প্রকম্পিত করিত, কিন্তু এখন রমণীর ওষ্ঠস্পর্শে তাহার কোমল-মধুর ধ্বনি যতদূর শুনা যায় ততদূর লক্ষ্মীদেবী অচলা হইয়া অবস্থান করেন। শঙ্খচূড়-বিনাশের আখ্যায়িকার সহিত জড়িত হইয়া এই শঙ্খ দেবতাদির পূজায় অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া বিজ্ঞাত, এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমুদায়ে শোভন শঙ্খের মধুর ধ্বনি গৃহলক্ষ্মীর যাহা কিছু পবিত্র, শুভ ও আনন্দদায়ক, তাহাই প্রকাশ করে। শুধু তাই নহে, রূপকের মধ্য দিয়া এই সমুদ্রজীবের জীর্ণ কঙ্কালের শব্দস্ফুরণে সঞ্জীবন সেই শব্দময় ব্রহ্মের স্ফুরণে প্রতীক গড়িয়া থাকে। জড় প্রকৃতির জাগরণে শ্যামলা ধরণীর গাত্রে চিরশ্যামল ও চিরজীবী দূর্ব্বা ধরণীর আশীর্ব্বাদ দানরূপে সকল শুভকর্ম্মের মাঙ্গলিক নিদর্শন এবং প্রাণরক্ষক ধান্য থই আলোচাল এবং শাদা সরিষা শাকম্ভরীর উৎপাদিকা শক্তিরূপে বিবাহানুষ্ঠানের আশু ফল সম্ভাবনায় সকল অবয়বেই ব্যবহৃত হয়, ভূমিমাতা বা সাগরলক্ষ্মীর যাহা দান, তাহাই মানবের ভাব, আদর্শ বা ভাগ্যের সহিত একটা মিলন স্থাপন করিয়া আমাদের জীবনের সহিত একটা নিবিড়তর পরিচয় স্থাপন করে। লতাপাতা গাছপালার সহিত নিবিড় সংস্পর্শ আমরা আমাদের গৃহকর্ম্মে পূজাপদ্ধতিতে রাখিয়াছি। শারদীয়া দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা স্থাপন ও পূজা সর্ব্বপ্রারম্ভেই হয়।

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥

প্রত্যেক বৃক্ষ বা লতা দেবীর কোন লীলার সঙ্গে জড়িত বা মহাদেবের অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রতীক হইয়া তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নবপত্রিকা-বাসিনী দুর্গানামে পূজা হইয়া থাকে। যেমন—

ওঁ কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রিয়ে।
নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকা॥

ওঁ হরিদ্রে রুদ্ররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে।
রুদ্ররূপেন দেবি ত্বং সর্ব্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

নবরাত্রের ব্রত উৎসব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রচলিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটা শারদীয়া প্রকৃতির উৎসব। প্রাচীনকাল হইতেই শরৎ-কালের প্রারম্ভে একটা সর্ব্বদেশব্যাপী উৎসব হইত। ব্রাহ্মণগণের পাঠ-অধ্যাপনা বর্ষার সময় স্থগিত থাকিত। বৌদ্ধরা আপনাদিগের বিহারের বাহিরে যাইতেন না। রাজন্যবর্গ দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইতেন না। এমন কি, নারায়ণ পর্য্যন্ত এই সময়ে শুইয়া থাকেন। কাজেই শারদাগমে উৎসবের বিপুল সমারোহ। সে আনন্দ সে সমারোহ বাল্মীকির রামায়ণে পর্য্যন্ত প্রতিফলিত রহিয়াছে। তাই এখনও দক্ষিণে ঘটের উপর ধান্যশীর্ষ রাখিয়া নবরাত্রের উৎসবে লোক ভগবতীকে অর্চ্চনা করে, উত্তরে যব ও গোধূমের শীর্ষসহ মহালক্ষ্মীর পূজা করা হয়। রাজ-পুতানায় নবরাত্রের সময় গৌরীর নিকট উৎসর্গীকৃত যবের শীর্ষ স্ত্রীলোকেরা সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব স্বামিপুত্রকে দান করে এবং তাহারা তাহা পাগড়ীতে গুঁজিয়া রাখে। পশ্চিম ভারতে এই সময় কোনকণী ভাড়বল রমণীরা দম্পতীকে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে। কায়স্থেরা অঙ্গবরণ করে। আত্মীয়জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরে শাঁইপাতা দেয় ও কোলাকুলি করে এবং যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র লেখনী পুস্তককে পূজা করে। রমণীগণ পরে ফুলের মালা করিয়া গীতসুরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে গৌরী ও ঈশ্বর-প্রতিমার উভয় পার্শ্বে চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে শোভা-যাত্রায় বাহির হয়। বাঙ্গালা দেশে নবপত্রিকা পূজা সেই শারদীয় উৎসবের প্রধান অঙ্গ ও পরিচয়। এই কলাবৌ পূজা খুব প্রাচীন, দশভূজামূর্ত্তি গড়িয়া পূজা নিতান্ত আধুনিক। শরৎকালে কলাপাতা, দাড়িম গাছের পাতা, ধান্য, হলুদ গাছের পাতা, মানপাতা বেলগাছের পাতা, জয়ন্তী গাছের পাতা, সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়, বসন্তে এদের কোন বাহারই নাই। প্রত্যেক

বৃক্ষ বা লতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তাহার কোন না কোন সংযোগ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, আমাদের ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা, পর্ব্বতমানিনী দেবতার উল্লেখ আছে। দেবতা গাছ বা পর্ব্বত বলিয়া আপনাকে মনে করেন। তাহার পর, দেবতা হইলেন গাছের অধিষ্ঠাত্রী, যেমন এই সকল নবপত্রিকার দেবতা। নব-পত্রিকার প্রথম গাছ কলা গাছ, ঠিক যেন তম্বঙ্গী, আবার অনেক কলাগাছ গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত লালে লাল—তাই তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী। দাড়িম গাছের ফুল দেখিলেই তাহার অধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা কেন হইল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী উমা, যাঁর রং ঠিক কাঁচা হলুদের মত। মানকচুর পাতার সহিত তাহার অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা দেবীর লোলহান জিহ্বার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। বেলগাছ শিবের অতি প্রিয়, তাই বেলগাছের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন শিবানী। অশোকের অধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকী, কারণ কার্ত্তিক হইতেই জয় বিজয়। এই নয়টি গাছকে কলার খোলায় মুড়িয়া বাঙালীর কল্পনা ও ভাবুকতা এই নবপত্রিকার সঙ্গে আর একটি লতা আদরে বরণ করিয়াছে,—ইহার নাম অপরাজিতা; অপরাজিতার ফুল সেই নীল নবঘনবরণী বালিকার মত, এবং অপরাজিতা নামটাও দুর্গার একটি বিভূতিকে প্রকাশ করে। তাই নবপত্রিকায় সন্তুষ্ট না হইয়া বাঙ্গালী কলাবৌকে সাধ করিয়া অপরাজিতার ভূষণ পরাইয়া দেয়।

কলাবউকে জোড়া বেল সম্বলিত বেলগাছের শাখার সহিত এমন ভাবে বাঁধা হয় এবং লাল পেড়ে সাড়ী পরাইয়া তাহার ঘোমটা দেওয়া হয় যে, নবযৌবনসম্পন্না পীনোন্নতপয়োধরা পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠে। কবে এই প্রাচীন শারদীয় উৎসবের নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবতা বাদ পড়িয়া ক্রমে চারিটি হইল—যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী বা ব্রহ্মাণী এবং কার্ত্তিকীর পরিবর্ত্তে কার্ত্তিক, এবং কবে তাহাদের

উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল তাহার ইতিহাস এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এইটাই প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের শারদীয়া পূজা শরৎকালের অশোক জয়ন্তী প্রভৃতি পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত গাছপালা লইয়া আরম্ভ ও শেষ। যদিও এই প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর পুরাণ, তন্ত্র ও লোকসাহিত্য নানা ভাব, কবিত্ব ও সাধনার স্তর গড়িয়া তুলিয়া বাঙ্গালীর ভাবুকতা ও মনীষার সাক্ষ্য দিতেছে—দুর্গোৎসবের এই নবপত্রিকা আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। ইহাদের ছাড়া বট ও অশ্বত্থ এবং নিম্ব ও তুলসীর শীতল ছায়া বা রোগবীজাণু-নিবারণ ও স্বচ্ছন্দতা সঞ্চারেই হউক অথবা বীজের জনন-শক্তি ও প্রকৃতির পুনরুৎপাদন ভাবের সঞ্চারেই হউক, নানা গল্প ও আখ্যায়িকাকে আশ্রয় করিয়া সেবা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে, শুভ বা অশুভ গৃহকর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে তাহাদের ফুলফলপাতার পরিচিত ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়।

পশুপক্ষী তরু-লতা সকলেরই মধ্যে এই প্রতীক বা রূপকের আত্মা বা স্বরূপ ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সেই উজ্জ্বল নবপ্রস্ফুটিত কহ্লার আমার অন্তরে শ্বেতপদ্মাসনা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর চরণকমলের স্পর্শ আনিয়া দেয় অথবা বিশ্বসৃষ্টির বিরাট্ বেদনা পুলকের অনুভূতি যেন মূর্ত্ত হইয়া আমার অঙ্গে অঙ্গে প্রতি বোধশক্তির মধ্যে সৃষ্টির প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া তুলে। পদ্মে যেমন একটি পর্ণের উপরে আর একটি পর্ণ সুসজ্জিত, এইরূপ অঙ্কুরন্ত চলিয়াছে, সেইরূপ সৃষ্টিও স্তরের পর স্তর জন্মাইয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া পঙ্ক হইতে জন্ম এই শ্বেত পদ্মের, তাই পদ্ম সমস্ত পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও আত্মার সেই অবিনশ্বর উর্দ্ধলক্ষ্য ও গতির প্রতীক। তাই যে দিকে চক্ষু ফিরাই, খোদিত মন্দিরগাত্রে কিংবা দৈনিক পূজার ধাতুপাত্রে, বিবাহ-চেলাঞ্চলে কিংবা বিচিত্র পটাঙ্কনে, কারুকার্য্যখোদিত দারুশিল্পে অথবা গৃহপ্রাঙ্গণের মাঙ্গলিক আলিপনায়, আমরা পুনঃ পুনঃ সেই পদ্মেরই অতুল শোভা ও তাহার

পরিচিত পঙ্কের মধ্যে শুভ্রের, সীমার মাঝে অসীমের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। তরুণীর অলক্তরাগরঞ্জিত মোহন চরণস্পর্শে রক্তিম অশোক কত না প্রণয় প্রণয়ীর আবেগপুলকময় আখ্যায়িকার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রেমপ্রণয়ের পরিণতির মূক সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। নীল নব ঘনের গুরু গুরু গর্জ্জনে যখন কলাপ-কলাপী উচ্ছ্বসিত নৃত্যে বিহ্বল তখন সেই শ্রাবণ বর্ষাপ্রকৃতির পুলক শিহরণ ফুটন্ত কদম্বফুলে আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই শ্রবণপথে সেই গোপী-বিরহী বংশীবাদকের আকুল স্বনন ধরণীর প্রেমে ব্যাকুল মেঘদলের রুদ্ধ বেদনার সহিত আকাশে, বাতাসে বনানী-লোকালয়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়া কিশোর-কিশোরীর প্রেমের মাঝে অনন্তবোধের বিচিত্র প্রতীক গড়িতে থাকে। অথবা রুদ্র বৈশাখের বালুকাতপ্ত শুষ্ক নদীগর্ভের বিপরীত তটে অবস্থিত চকাচকীর করুণ বিলাপ ও তাহাদের ক্ষণিক মিলন-সম্ভোগের অবিরাম প্রণয়ের পর্য্যায় মিলন ও বিরহের প্রতীকরূপে জন্ম ও মৃত্যুর সেই চিরন্তন বিচ্ছেদলীলার গাথা রচনা করে।

ভারতের জনসাধারণের চৈতন্যে সৌন্দর্য্য ও তুরীয় অনুভূতির বিশেষ ধারণাগুলি এইরূপে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধমূল হইয়া আমাদের জাতীয় প্রাণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুযায়ী চিত্রকলা ও অলঙ্কারের একটি বিশিষ্ট ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাব প্রকাশের এই বিশিষ্ট ছাঁদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে আমরা আমাদের চিরন্তন প্রতীকগুলির বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহাদের নিগূঢ় ও নিবিড় পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

পশুপক্ষী আমাদের দেবতাগণের বাহন হইয়া কিরূপে পূজার ভাগ পাইতেছে এবং প্রত্যেক দেবতার সহিত তাঁহার বাহনের কি স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সে কথায় বিশেষ আলোচনা এখন হইবে না। সর্প একটী সাধারণ প্রতীক, আমাদের গ্রামপথে শস্যক্ষেত্রে বা গৃহাঙ্গনে মনসা-

দেবী গৃহ ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সর্পের তির্য্যক্ ও বিদ্যুৎ চঞ্চল গতি ও তাহার চর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা চিরকালই বিস্ময় জাগাইয়াছে, কিন্তু ভীতি-বিস্ময়ের উপর সর্পের আবর্ত্ত বা কুণ্ডলাকৃতি যোগ সাধনার অনুলোম-বিলোমকে ইঙ্গিত করিয়া শেষনাগশায়ী নারায়ণ ও ফণিভূষণ যোগীবর শিবের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। সর্পের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধের ইঙ্গিতও যে কিছু আছে, তাহারও পরিচয় পাই। লিঙ্গযোনির পার্শ্বে অনেক সময়ে সর্পের অধিষ্ঠান। এই লিঙ্গ ও যোনি সেই পুরুষ ও প্রকৃতির অনাদি সঙ্গমলীলার প্রতীকরূপে সৃষ্টির কারণ ও কল্পনাকে প্রকাশ করে এবং বৃষভ সেই পরমপুরুষের বিশ্বসৃষ্টির জনন ক্ষমতাকে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারই বাহন হইয়াছে। Egypt, Phrygia, Babyloniaতে যৌন সঙ্গমকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্যকে বুঝাইবার জন্য যে অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানপ্রক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে রূপক ও প্রতীকের দিক্‌টা তত বেশী বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে এই ভারতবর্ষে। এখানে শিবলিঙ্গের প্রতীক অথবা বৈষ্ণবদিগের চিহ্ন একেবারে শুধু Conventional লৌকিক রীতিগত Symbol, প্রকৃতির বা মানুষের জননক্রিয়ার অনুকরণ ইহা হইতে একবারে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠান আমাদের ধর্ম্মসাধনার সহিত জড়িত হইয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের সুবিধাবিধান করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, তীর্থভ্রমণে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" আছে, যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে নাই, তাহার সুখ নাই। মানুষের বসবাসে যে খুব ভাললোক, সেও পাপী হয়, কারণ ইন্দ্র পরিব্রাজকের বন্ধু। তীর্থের সংখ্যা করা অসাধ্য। পদ্মপুরাণে সার্দ্ধ তিনকোটি তীর্থের উল্লেখ আছে, একমাত্র এই ভারতবর্ষে যে কত সহস্র তীর্থ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই! আর এইটাই খুব আশ্চর্য্য যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের অতীত ভৌগোলিক

ধারণাটি এখনকার ধারণা অপেক্ষা ব্যাপকতর ছিল। কাশী, কাঞ্চী, গয়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা, অবন্তী প্রভৃতি সকলদিক্‌কার নগর উত্তরের হিমালয় ও বদরিকা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিক্‌কার চন্দ্রনাথ হইতে পশ্চিমের দ্বারকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যেখানে রমণীয় স্থান আছে, তাহাই অতি পবিত্র। বিভিন্ন তীর্থে স্নান, দান, গমন, ও পূজা-তর্পণাদির আবশ্যকতা এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে, সমগ্র ভারতটা প্রদক্ষিণ করিতে পারিলেই শুভ। যেমন নৈমিষারণ্য, বারাণসী, অগস্ত্যাশ্রম, কৌশিকী, সরযূতীর, শোণ, শ্রীপর্ব্বত, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী, এই সকল তীর্থ শ্রাদ্ধে প্রশস্ততম। স্নানের জন্য নদীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রশস্ততম। ইহাও খুব স্বাভাবিক যে, নদীর যেখানে উৎপত্তি যেমন গঙ্গোত্রি, বা অমরকণ্টক, যেখানে নদীর প্রবাহ বিপুল ও উদ্দাম যেমন হৃষীকেশ, হরিদ্বার বা নাসিক যেখানে নদী দক্ষিণবাহিনী, যেখানে শাখা-প্রশাখা আসিয়া মিলিয়াছে যেমন প্রয়াগ, রামেশ্বর, দেবপ্রয়াগ কিম্বা সাগরসঙ্গম সবই পবিত্রতীর্থ, সেখানকার পূত সলিলে স্নান অতি পুণ্যের। সমগ্র ভারতবর্ষকে সম্মুখে রাখিয়া যখন যে সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই শিব, বিষ্ণু, সতী বা বিনায়কের পবিত্র ক্ষেত্রসমুদায় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে নির্দ্দেশ করিয়াছে। দৈনিক প্রার্থনার সময় এই সমস্ত পবিত্র তীর্থভূমির নাম দেবদেবীগণের সহিত উচ্চারিত হয় এবং সমগ্র দেশের চিত্র পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে।

নদী সরোবরে, পর্ব্বত উপত্যকায়, বন উপবনে, শ্যামল সমতল ভূমিতে, সাগরবেলায় অথবা আগ্নেয়গিরিনিতম্বে যেখানে যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের পবিত্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ যেখানে ধনীর জন্য হোটেল বা বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে আমরা আমাদের পরম পবিত্র মঠ মন্দির ধর্ম্মশালা, চৌলট্রী নির্ম্মাণ করিয়া

প্রকৃতির নিবিড়তর অনুভূতির আশ্রয়ে যাহাতে অতি দরিদ্রের পক্ষেও অনন্তবোধ স্বতঃই জাগরিত হইতে পারে, তাহার সুযোগ বিধান করিয়াছি। কাশ্মীর এমন রমণীয় স্থান যে, সেখানকার ভূমিতে তিলমাত্র স্থান নাই, যাহা পুণ্যভূমি নহে। প্রকৃতিকে ভারতবর্ষ নিঃসঙ্গভাবে ভোগ করিতে ভালবাসে। তাই অনেক সময় আমাদের তীর্থ সমুদায় দুর্গম গিরিকন্দরে, অথবা গহন বিজন অরণ্যমধ্যে, তমালতালীবনরাজিনীলা সাগরবেলায় অথবা বিপৎসঙ্কুল পর্ব্বতশিখরে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরসঙ্গমে, অথবা বলাকাশোভিত হ্রদ সরোবরে। প্রকৃতির ভীষণ বা কোমল, করুণ অথবা কঠোর, উদাস অথবা ভোগবিলাসী ভাবটি বিচিত্র স্থানে বিচিত্র রসবিগ্রহে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের পূজা পাইতেছে। তাই দক্ষিণে অনন্ত সাগরের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে শেষশায়ী নারায়ণ, মধ্যে মধুস্রোতা গঙ্গাযমুনার উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত্রে শ্যামসুন্দর অথবা অন্নপূর্ণা, উত্তরে চিরতুষারশুভ্র হিমাচল-তুঙ্গে চিরকঠোর শিবসুন্দর; পর্ব্বতে ভৈরব, চামুণ্ডা, লোকালয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মী ভগবতী রাজরাজেশ্বরী, অরণ্যে রুদ্র নৃসিংহ কালী, বালার্ক-স্নাত শান্ত সরোবরে ব্রহ্মা, প্রলয়ঙ্কর উর্ম্মিমুখর সাগরবেলায় প্রলয়ঙ্কর জনার্দ্দন; ভারতবর্ষ বিচিত্র রূপক, আখ্যায়িকা, গল্প, স্থলপুরাণ সৃষ্টি করিয়া আপনার বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কত না খণ্ড রসবিগ্রহে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এক এক স্থলে এক একটা শাক্ত-যন্ত্র সিদ্ধ পীঠ বলিয়া রক্ষিত। পরে সেই পীঠের উপর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া প্রতিমা বা মুখ ও হাত পা বসানো হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরাত্মাটি এইরূপে খণ্ডবিগ্রহে মানুষের অন্তরে সীমার মাঝে আপনাকে ধরা দিতেছে। কুমারিকা অন্তরীপের বিগ্রহ ও পূজাপদ্ধতির সহিত সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবস্তু ও ঘটনার যে সুসামঞ্জস্য আছে, তাহার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি। এই সুসামঞ্জস্যই, প্রকৃতির এই বহু বহু অনুকরণই ভারতের অসীমের সাধনার স্বাভাবিক ভিত্তি। কিন্তু ইহাকে

আশ্রয় করিয়া ইহার উপর স্তরে স্তরে যে মানবভাগ্য ও বিবর্ত্তনশীল অনাত্মা প্রকৃতির লীলায় কত বিচিত্র ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, প্রকৃতির প্রতিদানের সে দিক্‌টা অনেক সময় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

আমাদের চিত্রকলা ও অলঙ্কার যে বিশিষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইবার আলোচনা করিব।

(ক) বেদের সেই প্রথম প্রভাতের সামগানে আমরা প্রথম প্রকৃতির প্রতিদানের পরিচয় পাই। প্রাকৃতিক জীবনের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্য অসংখ্যপ্রকৃতি দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া নানা স্তব গান ও অলৌকিক গল্পের কারণ হইয়াছে।

(খ) বৌদ্ধযুগে ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতির এই দৈবমূলক ধারণা ও কল্পনা বস্তুতন্ত্র হইয়া সমস্ত প্রকৃতির অন্তরে প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছে। সহানুভূতি আরও জীবন্ত ও সতেজ হওয়াতে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু, পশুপক্ষী, লতাপাতা, বৌদ্ধশিল্প, চিত্রকলা ও লোকসাহিত্যে আলোকচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৈবের ভাব কিছু ঝরিয়া পড়িলেও আর একদিকে নৈতিক জীবনের প্রাচুর্য্য হেতু মানব-অদৃষ্টের সহিত বিশ্বের পরিণতি একটা সু-সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশাল ভাগ্যচক্রের অনুভূতি আনিয়াছে।

(গ) পরবর্ত্তী যুগে প্রকৃতির সহিত মানবের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আমাদের সুখ দুঃখ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের অবিরাম পর্য্যায়ের মধ্যে একদিকে ভগবানের সৃষ্টিরহস্য তাঁহার আত্মনিয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে যে অবিরত দুঃখভোগে একটা বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা আনিতেছে তাহারই আভাষ দেয়; অপর দিকে, তৎকালীন জাতীয় জীবনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও ক্ষুধা প্রকৃতির শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে সমাপ্তি লাভ করিতেছে, এবং সেই জন্যই আমরা বর্ণধর্ম্মের লালিত পালিত জীবনের পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পাই প্রকৃতির

নিবিড় অন্তরে, তপোবনে। তাহা ছাড়া মানুষের সহিত পশুপক্ষী ও তরুলতার সখ্যতা ও সৌন্দর্য্যের স্নেহ ও প্রীতিময় আদান প্রদান যে শান্তিরসাপ্লুত সৌন্দর্য্য-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে আধুনিক সভ্যতার কল্পনা তাহাতে স্তম্ভিত ও স্তিমিত হইয়া যায়।

আর এইখানেই ভারতীয় লোকসাহিত্যের বিশেষত্ব। প্রকৃতি ও মানুষের ভাব-বিনিময়, প্রকৃতি ও মানুষের অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য—একটা মৈত্রীর ভাব কেবল ভারতবর্ষই আনিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে কি গ্রীক সাহিত্য, কি পরবর্ত্তী Romantic সাহিত্য ও Renaissance উভয়েই এই স্বাভাবিক ও প্রকৃত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষের ও প্রকৃতির মধ্যে একটা দানবীয়, Titanic বা Promethean বিরোধকে অবলম্বন করিয়া মানুষকে চিরকাল ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত এবং প্রকৃতিকে মানব-অদৃষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন ও নির্লিপ্ত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিল্পকলা প্রকৃতিকে মানবচরিত্রের অনুযায়ী দৃশ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে, চীন চিত্রশিল্পী মানুষকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুযায়ী চরিত্র দান করিয়াছে, ভারতবর্ষ এই দুইয়েরই উপর-স্তরে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাত্মক সম্মিলন ও শৃঙ্খলা আপনার শিল্পে ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, কিম্বা মানবাত্মার জড়ের বন্ধনকে ছিন্ন করাইয়া আর একটা অতিপ্রাকৃত স্তরে এই প্রাকৃতিক জীবন-মরণ-লীলাকে দমন করিয়াছে।

(ঘ) পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যে দেখি যে, প্রকৃতির সহিত মানব-জীবন ও অদৃষ্টের পরিচয় এত নিবিড় হইয়াছে যে, প্রকৃতির বিচিত্র ও অভিনব লীলা নব নব বিগ্রহ ধারণ করিয়া, নব নব প্রতীকরূপে মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধের নিগূঢ় রহস্য-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। প্রাকৃতিক জীবনের রসসঞ্চারে উদ্ভূত পুরাতন কল্পনা এখন নূতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত হইতেছে। লীলাময়ী প্রকৃতির নিত্য

নব বৈচিত্র্য অথবা মানব-জীবনের বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা যে বিরাট্ শূন্যের দিকে প্রধাবিত, তাহাই সাহিত্য ও শিল্পে ব্যক্ত হইয়াছে অসংখ্যরূপ-কল্পনায় এবং অসংখ্যরূপের লীলাধার সেই অমূর্ত্ত আদ্যাপ্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে। আবার সেই মহাকাল বা মহাকালীর শূন্য গর্ভ হইতে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য একটা ক্রমপরিস্ফুটতার অবিরাম ধারা অবলম্বনে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্যপটে বিচিত্ররূপে অঙ্কিত হইতেছে কিম্বা বিরাট্ বিশ্বমঞ্চে সীমা ও অসীমের প্রেমলীলার অভিনয় পূর্ব্বরাগ, মিলন, অভিমান ও বিরহের ব্যঞ্জনায় অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে সিঞ্চিত।

ভারতবর্ষের শিল্পে সাহিত্যে সমুদায় ভাবই এখনও জাগ্রত, (১) প্রকৃতির একটা হুবহু অনুকরণ ও তাহাকে নৈতিক ও তুরীয় ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা (২) ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ একটা বিশালতর মানব ভাগ্য ও পরিণতির আশায় সহ্য করিবার ক্ষমতা (৩) প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই এক অমূর্ত্তের বহুরূপ, এবং সেই অমূর্ত্ত বহুরূপী হইয়া অনুলোম বিলোম গতিতে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সৃষ্টিপ্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছে আবার শূন্যে বিলীন হইতেছে, এই তুরীয় বোধ।

বর্ণভেদ।

শ্রেণীবিভাগের কারণ।

ভারতবর্ষের সমাজে উচ্চ নীচ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, আচরণীয় অনাচরণীয় লইয়া বিচার যে অনুদারতার সৃষ্টি করিয়াছে. তাহা অতি শোচনীয় বিষয়। এই বিচারের ভিত্তিতে যে সামাজিক কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা নহে, অথবা হিন্দুশাস্ত্রের নিত্যসিদ্ধ বিধি নহে। অথচ এই নিম্নত্ব ও পাতিত্য আমাদের সমাজে লৌকিক ব্যবহারের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই একজন পাশ্চাত্য মনীষী ভারতবর্ষের মানুষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জীব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—homo dissideus, সে শুধু আপনাকে পরস্পর হইতে তফাৎ রাখিতেই ব্যস্ত—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিভেদনীতি এতই প্রবল। সমস্যাটা কিরূপ ভয়াবহ, তাহা এই একটা কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাংলার অর্দ্ধেক সংখ্যার হিন্দু অপর অর্দ্ধকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না।

এটা ঠিক, সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় স্তরবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র ও সভ্যতা গঠনের একটা প্রধান উপকরণ জেতা ও বিজিত জাতির বৈষম্য। আর এই বৈষম্য যে ভারতবর্ষের অতীতযুগের ইতিহাসে জাতিবিভাগের মূল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাগত শুক্লবর্ণ আর্য্য ও আদিম কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের বিরোধই আহার বিহার ও যৌন সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইউরোপীয় জগতে রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া সেখানে জেতা জাতি বিজিতসমাজ হইতে আপনাকে চিরকালই পৃথক্ রাখিয়াছে। মধ্যযুগের chivalryর উৎপত্তি এইখানে,

আর এই সামরিক শ্রেণীর নীতি ও প্রথার সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগের জীবন ও চিন্তা কিরূপ জড়িত, তাহা যে ইতিহাস সমালোচনা করে, সেই জানে।

আজও অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের বৈষম্য আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে মাথা তুলিয়া রাখিয়াছে। সেখানে নিগ্রোদিগের প্রতি নির্ম্মম সামাজিক নিগ্রহ প্রজাতন্ত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। জার্ম্মাণীতে মধ্যযুগে knights, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষকের যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তাহা এমন একটা অসামঞ্জস্য সমাজে জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহার ফলে এই আধুনিক শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে জার্ম্মাণীতে Karl Marxর এত প্রভাব। শ্রেণী-চৈতন্য সেখানে ইউরোপের অন্য দেশের বহু পূর্ব্বে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং আজও তাহা ইউরোপের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত রাখিয়াছে। আর রুশিয়ায় এই অসামঞ্জস্য এমনই অসহ্য হইয়াছিল যাহার ফলে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব। রুশবিপ্লব এখনও চলিতেছে, সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর হইয়া কিরূপে আবার নূতন সমাজবিন্যাস দেখা যাইবে, তাহা নিরূপণ করিবার এখন উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপেই এখন ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, ব্যবসায়ী ও ধনীর প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে শ্রমজীবীর প্রভুত্ব ইউরোপের সমাজ-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

চীন ও ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা তত বেশী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাই যুদ্ধের ক্রীতদাস আমাদের সমাজে তত পরিচিত নহে। পরিবার, কুল, জাতি, গ্রাম ও শ্রেণীর প্রসার ও সমবায়ে প্রাচ্য সভ্যতায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বলিয়া এখানে আর এক ভাবে শ্রেণীবিভাগ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কর্ম্ম, ক্রিয়া ও ব্যবসায় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ তাই আদিম বর্ণবিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং যুগযুগান্তব্যাপী শান্তিপূর্ণ কৃষিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে একদিকে যেমন শাস্ত্রবক্তা ব্রাহ্মণজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অপর দিকে

অগণন অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহারা কৃষিকর্ম্মের নিম্নস্তরের কাজ চালাইয়া আসিতেছে, যেমন চামার, নমঃশূদ্র, জালিক, ভুঁইমালী, ঈড়ভ, পুলেয়া, মাহার প্রভৃতি।

চীনদেশে আমাদের ব্রাহ্মণজাতির মত মাণ্ডারিণদিগের উচ্চতা স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু এদেশের মত সেখানে এত শতধাবিভাগ নাই, বিবাহ-বিচার নাই, অন্ন-বিচার নাই, সামাজিক নির্য্যাতন নাই। যে কেহ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া মাণ্ডারিণ হইতে পারে; ব্রাহ্মণত্ব লাভের অনুরূপ অধিকার ভারতবর্ষ হইতে বহুকাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে অন্নবিচারে ভ্রান্তবিশ্বাস অনেক সময় যে কিরূপ অযৌক্তিকতার প্রশ্রয় দেয়, তাহা এখন না ভাবিয়া দেখিলে সত্য এ দেশে টিকিয়া থাকিবে কি না, সন্দেহ। বিবাহবিচার অনেক সময়ে বংশবিশেষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকিলেও জাতিবিশেষে যৌনসম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া যে দৈহিক দুর্ব্বলতা আনিতেছে; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বংশমালা সংগ্রহ করিয়া অভিজাত বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এই বিষয় সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকের এখন আলোচনা করা প্রধান কর্ত্তব্য। কৌলীন্য কাহাকে বলে, তাহাও জীব ও সমাজবিজ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়া লইয়া কৌলীন্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খেদের বিষয় পাতিত্য প্রথা। নিম্নশ্রেণীর যে অশুচি ও অসভ্যতা ভারতবর্ষের সামাজিক নিন্দা ও ঘৃণার মূল, তাহা নিতান্ত অপরিহার্য্যভাবে দেশে থাকিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ মালাবারে ইহা কি নিদারুণ সামাজিক নিগ্রহের কারণ হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কোন্ হিন্দুর না লজ্জায় বেদনায় মাথা হেঁট হইয়া যায়?

নিম্নজাতির উন্নয়ন।

হিন্দুসমাজ নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল—বর্ণব্রাহ্মণ ও পুরোহিত উহাদের শিক্ষা দীক্ষার ভার লইয়াছে, শিব ও

শক্তিপূজা তাহাদের আদিম গাছ, পাথর ও সূর্য্যপূজাকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, নিম্নজাতির নেতাকে রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পুরাতন totemএর পরিবর্ত্তে গোত্রের প্রভাব ও বিবাহবিচার দেখা গিয়াছে। এইরূপে নানা উপায়ে নূতন বিধি নিষেধের বলে যে কত নিম্ন জাতি শৌচাচার লাভ করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে সহজে অতর্কিত ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুধর্ম্ম ডঙ্কা না বাজাইয়া এইরূপে আপনাকে প্রচার করিয়াছে।

তাই এইটাই আরও দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজের এই কল্যাণকর অনাড়ম্বর প্রচার ও প্রসার কাজ আর সেরূপ চলিতেছে না। যাহা অস্ফুট, যাহা প্রতিরুদ্ধ, তাহাকে জাতীয়তার নূতন আদর্শের প্রেরণায় স্পষ্ট ও প্রখর করিয়া তুলা আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী আবেগাতিশয্যের ভিতর দিয়া সমাজপতিগণকে এই কর্ত্তব্যের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। সেদিন ত তিনি সোজা-সুজি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়ন না করিয়া স্বরাজ লাভ অসম্ভব।

ভাল করিয়া নূতন করিয়া এই জাতিভেদপ্রথা গড়িয়া তুলিতে পারিলে আধুনিক সভ্যতার নানা কুফল হইতে আমরা আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারিব সন্দেহ নাই। এটা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র নূতন আকারে দেখা গিয়াছে। পুরাতন প্রজাতন্ত্র যে আমলাতন্ত্রের রূপান্তর হইয়া শোষণ ও অত্যধিক শাসনের ব্যবস্থা আনিয়াছে, তাহাতে মানুষের স্বাধীনতা ও কর্ম্মকুশলতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। নূতন প্রজাতন্ত্র ছোট ছোট সংঘ ও শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে। পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহাই শিখাইবার জিনিষ।

আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতি পঞ্চায়েত যে তাহার স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে বিবাদ-নিষ্পত্তি, শৌচাচার-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, বৃত্তি ও কর

স্থাপন করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য নিবারণের ভার লইয়াছে, ইহা আমাদের জনসমাজের সজীবতার চিহ্ন। এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যদি কখনও আপনার ভাবে আপনার প্রজাতন্ত্র গড়িবার সুযোগ পায়, তবে এটা নিশ্চিত যে, জাতি পঞ্চায়েতগুলিকে সে তাহার প্রজাতন্ত্রের নিম্নতম স্তরে একটা অধিকার দেবেই।

মান্দ্রাজের জেলায় জেলায় নানা গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিয়া আসিয়াছি যে, উৎকট ভেদনীতির প্রভাব সত্ত্বেও সেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নিম্ন শ্রেণীর লোকও বিচার করিবার অধিকার পায়, গ্রাম্য উন্নতির জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে নিম্নশ্রেণীরা চাঁদা দিয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর ভগবতীপূজায় মহিষের দামের জন্য ব্রাহ্মণগণও কিছু চাঁদা দেয়, এবং গ্রামের দেবতাও মাসিক 'যাত্রা'র সময়ে শূদ্রপল্লীও ঘুরিয়া আসে। জাতি পঞ্চায়েত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ নীচ জাতির আত্মরক্ষার আধার, তেমনি গ্রাম-পঞ্চায়েত বিভিন্ন জাতির ক্রিয়া ও স্বার্থের সমবায়ের আশ্রয়। কুপ্রথা ও কুরীতি এই সমবায়কে যে লাঞ্ছনা করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই সমবায়ই আমাদের সনাতন প্রথা, আমাদের নিত্যসিদ্ধ রীতি। এই সমবায়কে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে এই সমবায় যাহাতে শুধু বারোয়ারী পূজায় নহে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষণোপযোগী নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানগার, কৃষি ও শিল্প-সমবায়ের অনুষ্ঠানে নূতন আকারে দেখা যায়, তাহার জন্য নূতন করিয়া সেবা ও সাম্যের বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে। উচ্চ ও নীচ জাতির সদ্ভাবে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ পল্লীগ্রামে যদি প্রজাতন্ত্র আমরা না গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে দেশে ভূম্যধিকারী ও মধ্যবিত্তের শাসন প্রজাতন্ত্রের নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া যাইবে এবং কৃষিপ্রধান দেশে তাহার অত্যাচার আধুনিক পাশ্চাত্য ইউরোপের আমলাতন্ত্রের অত্যাচার অপেক্ষা আরও অকল্যাণকর হইবে।

জাতীয় বিশুদ্ধি।

পুরাতন কাটামকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। কিন্তু দেবী-প্রতিমায় নানা আবর্জ্জনা আসিয়াছে। আমাদের মহামায়ার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য যে, সভ্যতার যত বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য তাঁহার বিরাট্ স্নেহময় ক্রোড়ে আসিয়া স্থান পাইয়াছে। কবে কোন্ অতীত যুগে প্রথম রবির কিরণপাতের সঙ্গে তপোবনে ভারতের ভাগ্য-বিধাত্রী ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে করিতে যে সামমন্ত্র শুনিয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। তিনি সেই মন্ত্রের দ্বারা বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় আনিবেন। যুগে যুগে ইতিহাস সে মন্ত্রকে হীনবল করিয়া দিয়াছে—পাঠান, মোগল বিদেশীর শাসনে তিনি হৃত-গৌরব হইয়া বিদেশী হইতে আত্মরক্ষা কল্পে আপনাকে কঠোর বিধানে বিধিনিষেধের লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন। তখন তিনি জাতীয়বিশুদ্ধিরক্ষা নিবন্ধন ক্রিয়া ও কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া জন্মাধিকারকে জাতিবিভাগের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যখন বীরাচারের বন্যায় দেশ প্লাবিত এবং নানা বিদেশীর আচার-ব্যবহারে ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্নীতির প্রকোপে দেশ জর্জ্জরিত, তখন তিনি বিবাহ-বিচার করিয়া সমাজস্থিতি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মুসলমান কালাপাহাড় যখন দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে তৎপর, তখন তিনি ধর্ম্মমন্দিরের পাহারাওয়ালার কাজ প্রবর্ত্তন করিলেন, ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে তিনি ভগবান্কে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়া শোধনের ব্যবস্থা করিলেন। কত যুগ অতীত হইয়াছে, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বুদ্ধ, কখনও রামানুজ, কখনও কবীর, কখনও চৈতন্য, প্রেমের দ্বারা এই অধিকারভেদকে খর্ব্ব করিয়াছেন, প্রীতির দ্বারা সামাজিক বৈষম্য দূর করিয়াছেন। তাহার পর আরও কত যুগ অতীত হইয়াছে, শ্রমের অধিকার আজ তাঁহার কর্ণে নির্ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্যের বায়ু তাঁহার অপর কর্ণে ক্রমাগত

শ্রেণীবিরোধ ও অত্যাচার-পীড়িত মানবের করুণ আর্ত্তনাদ শুনাইতেছে। শূদ্রশক্তি পরশুরামের বীর্য্য লইয়া প্রকাণ্ড হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে আজ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যশক্তিকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। বিশ্বজগতের শ্রম এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছে যে, তাহার গরম হাতলের ধূমকেতু-জ্বালা পৃথিবীর জন্ত মঙ্গলের মালা গাঁথিবে। কিন্তু জগৎ শ্রমের আস্ফালনে ভীত, চকিত। বিশ্বজগতের ভাঙ্গা-গড়ার বিক্ষোভের মধ্যে ভারতের শ্রেণী-গঠন ও সমবায়-প্রণালী সমাজ বিন্যাসের নূতন উপকরণ যোগাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এইবার ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার বেদান্তজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা হইবে, বর্ত্তমান যুগের অসামঞ্জস্যের নিদারুণ লীলার মধ্যে আমাদের মহামায়ার ঔদার্য্য ও বিশ্বপ্রেমিকতা এমন একটি সমাজ-শরীর সৃষ্টি করিবে যেখানে এখনকার সমস্ত শতধা ভিন্ন বিপর্য্যস্ত জাতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে পরস্পরের সমবায় অনুভব করিবে। হিন্দুসমাজ তাঁহারই সেই পবিত্র শরীর, এবং ভারত-ভাগ্য-বিধাত্রীর মন্ত্রই সেই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র।

আন্তর্জ্জাতিক বর্ণভেদ

বর্ণভেদ-সমস্যা

সে দিন আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সভাপতি বলিলেন যে জগতের এখনকার প্রধান সমস্যা বর্ণভেদ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ায় জাতি-বৈরী বিষমাকার ধারণ করিয়াছে ও তাহার মূল হইতেছে কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত জাতির বৈষম্য। বাস্তবিক এমনই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ ও শ্বেতজাতির বিভিন্ন অধিকার ভয়ানক বিরোধের কারণ হইবে। অথচ এইটাই আশ্চর্য্য যে জাতি-সংঘ কিংবা আমেরিকার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক এ বিষয় সম্বন্ধে একটা পাকা মীমাংসার কিছুই করিল না, বরং সমস্যাগুলাকে দেখিয়াও দেখিল না।

এসিয়ার জনবাহুল্য

এক কথায় বলিতে গেলে এ সমস্যার কারণ এই। এসিয়ার অনেক দেশে লোকসংখ্যা এমন বাড়িয়াছে যে দেশে আর সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। ৯০০,০০০,০০০ এসিয়াবাসী মাত্র অতটুকু ভূখণ্ডে দিনপাত করিতেছে, যাহা ৬০০,০০০,০০০ শ্বেতাঙ্গগণের অধিকৃত দেশের ছয় ভাগের এক ভাগ। এসিয়ার পাত্র এখন ভরপূর, তাই চারিদিকে এসিয়াবাসী ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। ভারতবর্ষ হইতে মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-আফ্রিকা, নেটাল, মাডাগাস্কার, ফিজি ও মালয়দ্বীপপুঞ্জে লোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। চীনা ও জাপানীরা আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার দ্বারে গিয়া ঠেলা-ঠেলি করিতেছে। অথচ দ্বার খুলা নাই। এদিকে ইউরোপবাসী প্রায় সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, এবং উষ্ণপ্রধান দেশে যেখানে তাহার বংশানুক্রমে বসবাস ও পরিশ্রম করা অসম্ভব, সেখানে সে ব্যবসায়-স্বত্ব আদায় করিয়া এমন কি দেশীয় জনগণকে স্থানভ্রষ্ট করিতেছে।

আমেরিকা ও কানাডার "প্রবেশ-নিষেধ"-তত্ত্ব

চীনা, জাপানী ও হিন্দুর জনপ্রবাহ রোধ করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডা আইন কানুন তৈয়ার করিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইউরোপের লোকদিগের সেখানে অবাধ গতি। ইহাদের সহিত চীনা, জাপানী ও হিন্দুর সামাজিক অবস্থার এমন প্রভেদ কিছুই নাই, যাহাতে এইরূপভাবে এসিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ নীতি অবলম্বন করা উচিত। এসিয়াবাসীর লোকসংখ্যা আমেরিকায় কখন খুব বেশী ছিল না। ১৯১০এ এই সমগ্র জনপ্রবাহের মধ্যে শতকরা ৫ জন এসিয়াবাসী, এবং প্রায় ৭০ জন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ইউরোপবাসী ছিল।

হিন্দুর সংখ্যা ১৭৮২

চীনা ৭৩,৫৩১

জাপানী ৭২,১৫৭

জাপানীরা কৃষিকার্য্যে সিদ্ধহস্ত। তাহারা ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছিয়া সাক্রামেণ্টো নদীর জলাভূমিতে আলুর চাষের সুবন্দোবস্ত করিয়াছে এবং ফ্রেস্নো ও লিভিংটন মরুভূমিকে আঙ্গুরের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়া জাপানীর কৃষিকার্য্যে উন্নতি অতি ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। বাস্তবিক, ক্যালিফোর্ণিয়া আমেরিকাবাসীর এইদিকে স্বার্থের উদ্বোধন করিয়া পীত ও কৃষ্ণ জাতির প্রতি বিদ্বেষ সর্ব্বাগ্রে জাগাইয়াছে।

জমি খালি পড়িয়া রহিয়াছে, লোকের অভাবে চাষ হয় না, মূলধনের অভাবে ব্যবসা হয় না, কিন্তু তবুও পীতজাতির প্রবেশ নিষেধ। অথচ পীতজাতিই জগতের কৃষিকার্য্যব্যাপারে অতি নিপুণ। কিন্তু জাতিভেদ নিপুণতা অনিপুণতা মানে না। অতিনিপুণতা সত্ত্বেও জমির সঙ্কুলান না হওয়াতে তাহারা দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। ঘরে নিতান্ত স্থানাভাব এবং তাহাদের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হারও আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা অনেক কম।

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	লোকসংখ্যা প্রতি মাইল
যুক্তরাজ্য	৩,৬২৭,৫৫৭	৯৮.৪	২৭.১৪
কানাডা	৩,৭২৯,৬৬৫	৭.৪	২.০
অষ্ট্রেলিয়া	২,৯৭৪,৫৮১	৫.৭	১.০৯
নিউজীলাণ্ড	১০৪, ৭৫১	১.০	১.০২
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৪৭৩,১৮৪	৫.৯	১২.৬২
ইউরোপ	...	...	১২৩.০
চীন	৪,২৭৭,১৭০	৩৩৬.০	৭৪.৫৭
ভারতবর্ষ	১,৭৭৩,০৮৮	৩১৫.১	১৭৭.৭৩
জাপান	১৪৭,৬৯৯	৫২.৩	৩৫৪.১৮

এটা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন না যে, ভারতবর্ষের কলিকাতা হইতে মাঞ্চুরিয়ার হার্ব্বিন সহর পর্য্যন্ত যদি একটা সরলরেখা টানা যায়, তাহার দক্ষিণপৃষ্ঠে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক বাস করে। সিন্ধু নদীর পশ্চিম এসিয়া খণ্ডে ও প্রকাণ্ড সাইবেরিয়া একরকম খালি—মোটে ৫ কোটি লোকের বাস সেখানে। সাইবেরিয়ায় এখন প্রতি বর্গ মাইলে কেবল একজন। কিন্তু সাইবেরিয়ার দিকে রুশজাতির যেরূপ অভিযান তাহাতে এসিয়াবাসীর সেখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই আশা করা যায় না।

শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া নীতি

ভৌগোলিক দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়া এসিয়ার এক খণ্ড। ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া ৭ দিনের পথ। চীন হইতে ১০ দিনের। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরদিকে ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জ। যদি যাতায়াতের বিঘ্ন না থাকিত, তাহা হইলে এতদিন চীনা, জাপানী ও হিন্দুতে অষ্ট্রেলিয়া ভরিয়া যাইত।

কিন্তু, সেখানকার ঔপনিবেশিক বলে, এসিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ। তাই আমরা দেখি, অষ্ট্রেলিয়ায় লোকসংখ্যা প্রতি মাইলে ১.০৯। জাপানের ৩৫৪ এবং ভারতবর্ষের ১৭৭। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার আকার প্রায় ভারতবর্ষের দেড়গুণ। যেরূপ ধীরে ধীরে অষ্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা এখন বাড়িতেছে, তাহাতে প্রায় ১,০০০ বৎসরে মাত্র ১০,০০০০০ হইবে, তখন প্রতি মাইলে মোটে ৩৪ লোকসংখ্যা হইবে অর্থাৎ জাপানের দশ ভাগের এক ভাগও নহে। অর্দ্ধেক লোক এখন পূর্ব্ব সীমানায় নগরে বাস করে। বাকী অর্দ্ধেক রেইল লাইনের ধারে ধারে গ্রাম অথবা কয়লার খনিতে। বাকীটুকু একেবারেই অনধিকৃত।

ইহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এমন একটা প্রকাণ্ড দেশ কিছুতেই বেশীকাল খালি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আশে পাশে যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমশীল ও বহির্গামী লোকের বাস। এসিয়া তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল লোকসংখ্যার অভাব মোচন করিতে অপারগ অথচ এসিয়ার এক অংশে এসিয়াবাসীর স্থান নাই। ঔপনিবেশিকের যুক্তি এই যে, তাহার মজুরী এসিয়াবাসী অপেক্ষা অধিক। তাহার অভাব সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে উচ্চতর সভ্যতার পরিচায়ক। এই মাপকাটিতে এসিয়াবাসী ও ঔপনিবেশিকের মজুরীর তারতম্য যে রকম উপায়েই হউক রক্ষা করিতে হইবে।

এসিয়াবাসীর দাবী

কিন্তু উত্তর এই যে, ঔপনিবেশিকের খাদ্য ও পরিচ্ছদ-বিষয়ক অভাব শীতপ্রধান দেশের অনুযায়ী, তাহা উষ্ণপ্রধান দেশে অনাবশ্যক। সুতরাং আবেষ্টনের প্রয়োজনের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে ঔপনিবেশিকের মজুরীর হার অনুমোদন করা যায় না। বিশেষতঃ, দোকানী, ফেরিওয়ালা, মালী, পাচক, সূতার-মিস্ত্রী, ধোপা প্রভৃতির কাজে ঔপনিবেশিক অপেক্ষা চীনা ও জাপানী অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। সেখান-

কার আব্‌হাওয়াও এরূপ যে ইউরোপবাসীর পুরুষানুক্রম ধরিয়া বসবাস অসম্ভব। যদিও "কুইন্স ল্যাণ্ডে" ঔপনিবেশিকের মৃত্যুসংখ্যা খুব কম, কিন্তু গ্রীষ্মের দিন ও রাত্রি তাহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অষ্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগেই গ্রীষ্মের আধিক্য। সেখানে এসিয়াবাসীর শ্রম ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বৈজ্ঞানিকের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থপরতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। ইংরাজ মনীষীরাও এ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিতর্ক এই স্বার্থপরতাকে হঠাইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। সাম্রাজ্যের সৌসামঞ্জস্যের খাতির এতকাল শ্বেত-অষ্ট্রেলিয়া-নীতি অগ্রাহ্য করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের এক প্রান্তের কয়েকটি নগরের মুষ্টিমেয় কূটনীতি-বিশারদ সাম্রাজ্যের দাবী কি ভবিষ্যতেও অমান্য করিবে?

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি

এদিকে সমগ্র পৃথিবীতে খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের অভাব অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর নবীন ইউরোপ ও আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর মাল মসলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। এসিয়া তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। চীনে সে দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু দ্বার ভাঙিয়া ইউরোপ একহাতে বাইবেল ও আর এক হাতে তুলাদণ্ড লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে এসিয়াবাসীর অনাহারের অবস্থা। এসিয়ায় আহার্য্যের অভাব হইলে পাশ্চাত্যজগতেরও যে বৈষয়িক উন্নতির বিপুল সাধনা বাধা পাইবে। এসিয়ায় ন স্থানং তিলধারণস্য। তাই এখানে প্রাণধারণের ব্যবস্থা, কৃষির এমন সুবন্দোবস্ত, হস্তশিল্পের এমন উন্নতি। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ মাংসাহারের ব্যবস্থা দেয় না। খাদ্যের জন্য পশুপালন অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে পশু নিয়োগে অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। এত করিয়াও দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। মনসুন্ বৃষ্টির উপর এসিয়ার নির্ভর। তাহা একণে অনিশ্চিত। সুতরাং চীন ও ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ

প্রায়ই বর্ত্তমান। জাপান তাহার শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী, তাহার বহির্গামী লোকসংখ্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থার জন্য কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও সাংটুংে অভিযান করিয়াছে। ওয়াশিংটনের বৈঠকে যদি প্রাচ্যজগতে শান্তি-স্থাপনের জন্য জাপানের শক্তি-মত্ততাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয় ও সন্দেহের কারণ বলিয়া অনুমিত হইল, তবে এসিয়াবাসীর সহজ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে তাহার বহির্গমনের একটা ব্যবস্থা কেন হইল না? আমেরিকায় পদার্পণ করিলে হিন্দু দণ্ডনীয়। জাপানী কালিফোনিয়ায় কৃষির ও কৃষিজাত শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া নিপুণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইল, কিন্তু তাহাতেও সে অনধিকারী। অর্থনীতির দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে, এই যুক্তিটিকে না। অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিতে গেলে সমস্ত জাতি ও দেশের স্বাভাবিক লোকসংখ্যার পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা চাই। সেখানে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীতের প্রভেদ নাই। কিন্তু এ বিচার জাতি-বৈঠকে হইল না। জাতি বৈঠকে হিন্দু মূক এবং চীনার সাহস প্রগল্‌ভতা বলিয়া বিচারিত। এদিকে এই সকল সংস্কার সুবিচারের অভাবে বর্ণ-বৈরী বিষম আকার ধারণ করিতেছে। জনবহুল এসিয়া ভূখণ্ডের নিকট পাশ্চাত্য জাতির 'প্রবেশ-নিষেধ নীতি' যেমন তাহার উন্নতির অন্তরায়, তেমনি তাহার আত্মমর্য্যাদার হানিকর। অপরদিকে পাশ্চাত্য-জাতি-সমুদায়ের-সাম্রাজ্য-নীতি ক্রমাগত স্বার্থের প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইয়া তুলিতেছে। তাই নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের পর্দ্দার অন্তরালে আজ অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনা যায়। যাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা অপরহস্তে তাহাই পুনরায় ধারণ করিতেছেন। শুধু পৃথিবীতে যাহারা অস্ত্রের উপর বিশ্বাস করে না, তাহারাই এখন এই শান্তির যুগেও হাস্যাস্পদ।

ব্যবসায়ে বিশ্বজনীনতা

এটা ঠিক, জগতের বিভিন্ন জাতি সমুদায়ের সখ্য-বন্ধনের যে বিরাট্ আয়োজন হইতেছে, তাহাতে আমরা রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধের কথাই বেশী শুনিতেছি। কিন্তু জগতের অশান্তি ও যুদ্ধের মূল কারণ বৈষয়িক। বস্তুতঃ পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা না আনিতে পারিলে যুদ্ধের কারণও বর্ত্তমান থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যবসাক্ষেত্রে এত অসাম্য, অবিচার রহিয়াছে যে, তাহা লইয়াই পাশ্চাত্যজাতি সমুদায়ের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য এখনই ঘটিতেছে। বার্লিন ও ব্রুশেলস্ কন্‌গ্রেস আফ্রিকার অসভ্য অথবা অর্ব্বাচীন জাতি সমুদায়ের সমাজ-বন্ধন যাহাতে ব্যবসায়ী ও মূলধনীর স্বার্থের আঘাতে ছিন্নবিছিন্ন না হয় তাহার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেইগুলি প্যারিসের সভায় অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু তাই নয়—উপরন্তু ঐ গুলির ভিত্তিতে নূতন Mandatory system অথবা দায়িত্ব-মূলক-ভার-প্রাপ্ত সভ্যজাতি কর্ত্তৃক অসভ্যজাতির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থাও শুরু হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবি-সংঘ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমুদায়ের মধ্যে পরিশ্রমের ঘণ্টা, মজুরি, কারখানায় শিশু ও স্ত্রীলোক নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমীকরণের চেষ্টা করিতেছে। আরও নানা দিক হইতে বিভিন্ন জাতির বৈষয়িক শক্তির সমবায় না হইলে পৃথিবীর শান্তি সুদূর-পরাহত। নিম্নে আমরা কয়েকটী বিষয়ের সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন উল্লেখ করিলাম।

(ক) জগতের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে কোন কোন জাতি খুব ভাল অংশ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। কোন কোন জাতির পক্ষে সূর্য্যের নীচে স্থান পাওয়াই কঠিন হইয়াছে। খাদ্য-শস্য ও কারখানার কাঁচা মালের ইউরোপে এখন যেরূপ অভাব তাহাতে জাতিবৈঠকে পরস্পরের অভাব বিচার করিয়া প্রয়োজন মত রপ্তানি-ব্যবস্থা আবশ্যক।

(খ) ব্যবসায়ের জন্য স্থল ও জলপথ একেবারে অবারিত থাকা উচিত। কোন এক জাতির পক্ষে যদি সমুদ্রের পথ খোলা না থাকে তাহা হইলে অপর জাতি তাহার অন্তর্বাণিজ্যের দ্রব্যসমুদায়ের উপর শুল্ক বসাইবে না, এমন কি আন্তর্জ্জাতীয় বিধি ব্যবস্থা অনুসারে কোন বিশিষ্ট দেশের খাল টানেল অথবা রেলপথ যাহাতে অন্য দেশের ব্যবসা বা অন্য প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার হইতে পারে তাহাই করা আবশ্যক।

(গ) যেরূপ ভাবে জগতের সব দেশেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিতেছে এবং তাহাতে যেরূপ অশান্তি সকল জাতিদিগের মধ্যেই দেখা দিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর সোণা ও রূপার পরিমাণ ও প্রচলন সম্বন্ধে একটা বিধিনিষেধ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বাড়িলে কমিলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে বিষম অনর্থপাত ঘটে এবং মূলধন সহজভাবে দেশ বিদেশে প্রচলন না হইলে যে ব্যবসায় হানি ঘটে, তাহার প্রতিরোধ এখন আবশ্যক।

(ঘ) সমবেতভাবে ও যৌথ-প্রণালীতে জাতিবিশেষকে জাতি সমুদায় কর্ত্তৃক ঋণদান আবশ্যক। কোন বিশেষ জাতির নিকট কোন দেশ কর্জ্জ লইলে তাহাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার হানি হয়। চীন ও পারস্য দেশ এইরূপে তাহাদের সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। নূতন জগতে যাহাতে আবার কর্জ্জ লইয়া কোন দেশ তাহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধীকারিগণের দাসখত না লিখিয়া দেয়, তাহার জন্য আন্তর্জ্জাতিক যৌথ-ঋণদানের ব্যবস্থা আবশ্যক।

(ঙ) উত্তরোত্তর পৃথিবীর লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহার উপযোগী নূতন খাদ্য-শস্য ও ব্যবসার উপকরণসামগ্রী যোগাইবার জন্য সাহারা মরুভূমি, মধ্য এসিয়া ও সাইবেরিয়ার বনপ্রদেশ কিংবা মধ্য-আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অকর্ষিত-ভূমি সংস্কার করা অদূর ভবিষ্যতে আবশ্যক। যেরূপ মূলধন ও কার্য্যদক্ষতা ইহাতে প্রয়োজন, জাতি-সমুদায়ের সমবেত কার্য্য ভিন্ন তাহা অসম্ভব।

(চ) পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইউরো-আমেরিকান্ জাতির অবাধ-গতি এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদেরই অবাধ প্রভুত্ব। এদিকে প্রাচ্য এসিয়ার জন-বাহুল্য সঙ্কুলান না হইয়া চারিদিকে উপছাইয়া পড়িতেছে।.: অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা প্রাচ্য এসিয়ার জাতি সমুদায়ের বসবাসের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কিন্তু এই দুই প্রদেশই প্রাচ্য দেশবাসীর আগমনে, বিশেষ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা করিয়া আইন-কানুনের দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিয়াছে। অথচ চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীয় স্বার্থ ও প্রভাবমণ্ডল চীনের ঐক্যসাধন ও স্বাধীনতার হানি করিতেছে। আর একদিকে উষ্ণ-প্রধানদেশে যেখানে মূলধনী-সম্প্রদায় আপনাদিগকে শ্রমজীবি-শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীব মনে করিয়া বিদেশ হইতে শ্রমজীবিগণকে আমদানী করিতে থাকে, সেখানে শ্রমীগণের অবস্থা অত্যন্ত হীনতা ও ঘৃণার্হ হয়। কুলী-দেশ, কুলী-জাতি, কুলী-স্বর্গ যেন আলাদা হইয়া মূলধনীদিগের মনোজগতে বিরাজ করে। কুলীরা নিতান্ত অসম্বদ্ধ, দল ও নেতাহীন; সুতরাং তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই। এক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক আইনকানুনের দ্বারা শ্রমনিয়োগ, এবং শ্রমনিবাস সম্বন্ধে ব্যবস্থা না হইলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া মূলধনীদিগের যথেচ্ছ ভূমি-সংগ্রহ অথবা শ্রমবাধ্যকরী টেক্স-স্থাপন, কিংবা চুক্তিমূলক শ্রমনিয়োগ প্রভৃতি যে ভাবে সমাজবন্ধন শিথিল করিয়া আফ্রিকার নানা জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ প্রয়োজন হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বিধান ও তত্ত্বাবধান ভিন্ন ইহা অসম্ভব। দেশবিদেশের শ্রমজীবী সমুদায়ের আমদানী রপ্তানি বিষয়ে পরস্পরের সমান অধিকার ও আদান-প্রদান জগতে না আসিলে অসাম্য ও অবিচার জাতিতে জাতিতে শত্রুতার বীজ বপন করিতে থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিক বিধানে ভাবুকতা

আন্তর্জ্জাতিক সভা সমুদায়ের প্রধান দোষ হইয়াছে যে, জগতের সমস্যা-গুলির বিচারে ইউরোপেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকার রহিয়াছে। এমন কি শ্রম-সভারও এই দোষ এবং এই লইয়া গত বৎসর যখন ভারতের সভ্যগণ প্রতি-

বাদ করেন, সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নাই। জাতিতে জাতিতে ভিন্ন বিচার প্রতিকূলে জাপান যে প্রস্তাব আনিয়াছিল তাহার মীমাংসা কিছুই হয় নাই। এদিকে আফ্রিকায় বুনো ও অসভ্যজাতির ধ্বংস, নিউ হেব্রাইডিসে অসভ্য-জাতির সমূল বিনাশ প্রভৃতিতে লোকে জাতি-বৈঠকের তৈয়ারী নূতন দায়িত্ব-বোধমূলক ব্যবস্থাকে খুব বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। চীনদেশে পাশ্চাত্যজাতি সমুদায়ের প্রভুত্ব-রেখা এখন সরলভাবে না চলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। বিশেষতঃ ইয়াংসি-অঞ্চলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার কোন মীমাংসা হয় নাই। জাপানী ও চীনা-শ্রমীর পাশ্চাত্য দেশের অধিকার সম্বন্ধেও কিছুই নিষ্পত্তি হইল না বরং আমেরিকায় সমস্যাটা ক্রমশঃ আরও জটিল ও আশঙ্কাপ্রদ হইতেছে। ভারতবাসীর অধিকার সাম্রাজ্যের অন্য প্রদেশ যদিও স্বীকার করিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকা একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছে। নূতন জাতি-সভা অনেক আশার সৃষ্টি করিয়াছে, অনেক আশারও বিনাশ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, যুদ্ধের আয়োজন সংক্ষিপ্ত করিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়া; এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় শক্তির লীলাক্ষেত্র প্রাচ্য ও উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণকে সজীব রাখা। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং দেশীয় শ্রমজীবীদিগের সম্বন্ধ আন্তর্জ্জাতিক বিবেকবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে শোষণ চলিতে থাকিবে—তাহাতে ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আফ্রিকা ও প্রাচ্যদেশবাসীদিগের অবিশ্বাস বাড়িতেই থাকিবে। ধলো-জাতির অষ্ট্রেলিয়া ও নাইরোবি সেখানে ধলোর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর অধিকার ও বর্ত্তমান কালোজাতির প্রবেশ নিষেধ এই ব্যবস্থা যে সকল সভ্যজাতি করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর সমস্যার ন্যায়ানুমোদিত মীমাংসা করিতে অপারগ—তাঁহাদের সে উদারতর দৃষ্টি নাই। চীনের সে সমগ্র দৃষ্টি আছে—সে সমগ্র প্রেম ও জ্ঞান আছে। চীনের কনফুসিয়াস ও লাওট্জের নীতির ধর্ম্ম মনুষ্যের মধ্যে কোন গণ্ডীই স্বীকার

করে নাই, তাই চীনই সেই টায়-পীঙ্‌ জগৎব্যাপী শান্তির মোহন স্বপ্ন প্রথম দেখিয়া অধীর হইয়াছিল, কিন্তু চীন এখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন—ভারতের সে দৃষ্টি ছিল—বুদ্ধের ও অশোকের ভারতের সে ব্যাপক জ্ঞান ছিল—কিন্তু ভারতও এখন হীনবল, অন্ধ। চীনের সেই উদার মানব-ধর্ম্ম, ভারতের সেই ব্যাকুল মৈত্রীর ভাব না আসিলে জাতি-সভার কাজ নিতান্ত যন্ত্র-চালিতের মত চলিবে। ভাবুকতার বন্যায় বর্ত্তমান অন্ধকারকে ডুবাইয়া নূতন স্বপ্নময় আশার দ্বীপকে সমুদ্র হইতে কে উদ্ধার করিবেন? সে সমুদ্রে কত বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার শার্লিমান নেপোলিয়নের আশা অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধুর স্বপ্ন আজও সেই জলকে বর্ত্তমান সভ্যতার পরিশ্রান্ত সন্ধ্যায় রঙীন করিয়া তুলে, সেই জলকে বিশ্ব-ধর্ম্মী আকবর আপ্লান-পূত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। বুদ্ধদেবের অহিংসার ধর্ম্মও অর্দ্ধ জগৎকে আজও মুগ্ধ রাখিয়া ভারতে স্থান পাইল না। ভারত-বর্ষের ইতিহাস ভারতের আত্মাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে, কিন্তু ভারতের লাঞ্ছিত আত্মা জগতের এই সন্ধিক্ষণে কি একবার জাগিয়া উঠিবে না, তাহা হইলে বিশ্বের ইতিহাস যে নূতন হয়, শত শতাব্দীর ব্যর্থ আশা যে সার্থক হয়!

ভারতের নীরব প্রজাতন্ত্র

গ্রীষ্মদাহন

এস শ্রাবণের ঘনঘোর বরষায় হিমগিরির এই সানুদেশ বাংলায়, নবজীবনের আশার সঞ্চার করিয়া, নীল-নবঘন-মেঘ-মেদুরের মত; মৃত কল্পনার জীর্ণ জঞ্জাল, ভগ্নহৃদয়ের মলিন ধূলা উড়াইয়া দিয়া এস আষাঢ়-গগনের স্নিগ্ধ-সজল জলদ-কান্ত সুন্দর তুমি,—দারুণ গ্রীষ্মের দাহনে পীড়িত ও কাতর অন্তঃকরণ আমার আজ তাপিত তরুলতার মত তোমার রোষ-কষায়িত চক্ষুতে, তোমার বুকের ভিতর বিদ্যুৎ ঝলকে ভীত হইবে না। বজ্রাগ্নিকে মাথায় করিয়া শ্যামলা ধরণীর আজ নবজীবনের সূচনা হইবে।

জাতি-সংঘের দুরাশা

বিশ্বজগৎ বলিতেছে আজ নূতনের সূচনা। আমার বাংলা দেশকে আজ দেখিতেছি শুধু ব্যর্থ আশার গলিত শব, জীর্ণ কল্পনার শুষ্ক কঙ্কালে ভরা ধূসর বালুকাস্তূপ। বিশ্বজগৎ বলিতেছে বিশ্ব-জাতির সংঘ অধীন ও শিশু-জাতি সমুদায়ের স্বাধীনতা ও মঙ্গলকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তির, হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করিয়া। আমরা দেখিতেছি তাহা নহে; শুধু একটা বিজিগীষু সাম্রাজ্যতন্ত্র নূতন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, অর্ব্বাচীন জাতির স্বার্থকে বলি দিয়া নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া গেল, বিশ্বের মতামতের পরিবর্ত্তে কূটনীতিকে আশ্রয় করিয়া, সহজ সরল ও অবাধ আলোচনার পরিবর্ত্তে সংগোপন ও প্রতারণাকে আশ্রয় করিয়া। ফ্রান্স মিত্রশক্তির অমতকে অগ্রাহ্য করিয়া অছিলায় রাইন নদীর অপর পারে সসৈন্যে উপনিবেশ করিয়া বসিল—জিগীষু লোকের

(Foch) অধীনে ফ্রান্স এখন সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী। প্রাচ্য জগতে জাপান আজ জয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া মিথ্যা ও অন্যায়ের জাল বুনিয়া চীন জাতিকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে তৎপর। এ যেন শান্তিভঙ্গের উদ্যোগ-পর্ব্ব। এবার আবার বর্ণভেদ জাতিসমুদায়ের স্বার্থের বিরোধকে আরও বিপুল সংঘর্ষের দিকে টানিয়া আনিতেছে।

প্রাচ্য-শ্রমজীবীর শোষণ ব্যবস্থা

বিশ্বজগৎ বলিতেছে, আজ শ্রমজীবীগণের নবজীবনের সূচনা। ধনীর অধিকার শ্রমজীবীর জীবনের অধিকারকে আর হঠাইতে পারিবে না। কারখানা অথবা খনির আভ্যন্তরীণ শাসনে শ্রমজীবী ধনীর পার্শ্বে বসিয়া আপনার স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষা করিতে তৎপর। দিনে ছয় ঘণ্টার কাজ ও অধিকতর অবসর—এবার শ্রমজীবীগণের জীবনে স্ফূর্ত্তি ও সফলতা আনিবে। আমরা এখানে দেখিতেছি, এই চীন ও ভারতবর্ষ দেউলিয়া পাশ্চাত্য জাতি সমুদায়ের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হইয়া উঠিল, এখানকার অল্পব্যয়-সঙ্কুল শ্রমজীবন একটা বিরাট্ শোষণযন্ত্রের অংশ হইয়া আপনাকে আপনি ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয় শ্রমজীবীগণের কাজের ঘণ্টা কমাইবার কথা আমেরিকার সেই বিরাট্ শ্রম-সভায় আপাততঃ স্থগিত রহিল। আর জাপানই বা ইউরো-আমেরিকার উপদেশ শুনিবে কেন? জাপান তাহার শ্রমজীবীগণের হাড় মাস পিষিয়া, তাহার মেয়ে কুলীগণের স্বাস্থ্য ও সতীত্বকে লাঞ্ছিত করিয়া পাশ্চাত্য জাতিসমুদায়ের রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ের পরিসরবৃদ্ধির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষা করিতেছে।

পণ্ডিত-মূর্খ আমেরিকা

আমেরিকা ইউরোপীয়গণের স্বার্থসংঘর্ষ ও জাতিবিরোধ, কূপমণ্ডুকত্ব ও গোঁড়ামিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, মনরো-মণ্ডলের আশ্রয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ভাবুকতা রক্ষা করিতে প্রয়াসী। পণ্ডিত-মূর্খ

আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আকাশ-পথে চীৎকার করিয়া, বিশ্বের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া বসিল। এদিকে চতুর জাপান প্যাসিফিকে আর একটি মনরো-মণ্ডলের গণ্ডী সৃষ্টি করিতেছে। শাদা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত আপাততঃ যে হলদে জাপানের শ্রম বিস্তার ও উপনিবেশের বিরোধ, তাহারা মীমাংসা যে অদূরবর্ত্তী কালে প্রচণ্ড সামুদ্রিক যুদ্ধে দেখা যাইবে, তাহা সকলেই বলিতেছেন। তাই আমেরিকা জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অজস্র পরিমাণে যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া চলিতেছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও প্রজাশাসনে সংঘের দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ধারা নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই বলিতেছে, বিশ্বজগতে প্রজাতন্ত্র এবার নূতন ভাবে গঠিত হইবে। যে রাষ্ট্র এতদিন জীবনের সব দিকেই আপনার অধিকার বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিল, এখন সে তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে উন্মুখ। সব দিকেই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ দেখা যাইতেছে। ইউরোপের অধিকাংশ খণ্ডে এখন এই সোভিয়েট অথবা সমূহ-তন্ত্রের প্রতিপত্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমিতি এবং শিল্পী শ্রমজীবীদিগের "পুগ" সমুদায়ের সমবায় সোভিয়েট শাসনের ভিত্তি। রুশিয়ার এই সমূহতন্ত্র আপাততঃ চরমপন্থী বলশেভিষ্ঠ-দিগের আয়ত্তাধীন; কিন্তু ইহা যে একপ্রকার নূতন প্রজাতন্ত্র, তাহার পরিচয় শুধু রাইন নদ হইতে বৈকাল হ্রদ এবং ডানিয়ুব হইতে অক্লাস পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা নয়। স্থানবিশেষ নহে, অধিকার ও স্বার্থ বিষয়ের দিকে প্রজাতন্ত্র যে তাহার সভা নির্ব্বাচন বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতেছে, তাহা এই সোভিয়েট রীতির প্রভাবের ফল। তাই পুরাতন দলবিভাগকে ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয় বা সমবায়ের পক্ষপাতী। আর এক দিক হইতে ফ্রান্সের Syndicalism অথবা শ্রেণীতন্ত্র, এবং ইংলণ্ডের Guild-

Socialism অথবা "পুগ" তন্ত্র, কেবল মাত্র যে বৈষয়িক জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমূহের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা নহে, সর্ব্বভুক রাষ্ট্রের অধিকার থর্ব্ব করিয়া লোকসংঘের দৈনন্দিন জীবনে একটা কর্ম্মঠ ও দায়িত্ববোধমূলক প্রজা-শাসনের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শ্রমজীবিগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে পার্লামেণ্ট হইতে শ্রমজীবিসংঘে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র সরিয়া যাইতেছে। এমন কি আমেরিকায় এক একটি বড় ব্যবসায় এক একটী স্বাধীন রাষ্ট্রের মত গড়িয়া উঠিতেছে। সব দিকেই সংঘগঠনের উদ্যোগ চলিতেছে। শুধু যে আয়র্লণ্ড অথবা স্কটলণ্ডের অথবা উত্তর ফ্রান্স খণ্ডের স্বায়ত্তশাসন, তাহা নহে; চার্চ্চ, ব্যবসায়, মিউনিসিপালিটি, বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার, এবং খণ্ড খণ্ড স্বাধীন জীবনের আধার হইয়া পুরাতন রাষ্ট্রের সর্ব্বতোমুখী দায়িত্বের পরিবর্ত্তে সংঘের সমূহ দায়িত্বকে ফুটাইয়া তুলিতেছে।

ভারতের নীরবপ্রজাতন্ত্র

এই গেল বিশ্বজগতে প্রজাশাসনের অভিব্যক্তি। আমাদের ভারতবর্ষে দেখি ঠিক বিপরীত অবস্থা। ভারতবর্ষ চিরকালই একটা নীরব অথচ কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্রকে তাহার গ্রাম্য সমাজে, তাহার জাতিপঞ্চায়েতে সজীব রাখিয়াছে। এই সে দিন তানজোর, মালাবারে বহুগ্রাম দেখিয়া আসিলাম, সেখানে এখনও সেই মন্বাদি স্মৃতির সমূহ ও শ্রেণীনাম বিলুপ্ত হয় নাই, গ্রামবাসী ও শিল্পিগণ "গ্রাম সমুদায়ম্" রক্ষা করিতে প্রয়াসী, গোচারণ ও পতিত ভূমির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, বিঘা প্রতি অথবা তাঁত প্রতি টেক্স বসাইয়া "সমূহ-পণমের" পুষ্টি সাধন করিতেছে, সমবায় প্রণালীতে শ্রম যোগাইয়া পূর্ত্তবিভাগ চালাইতেছে, দরিদ্রভাণ্ডার হইতে দীনহীনকে প্রতিপালন করিতেছে, সকলের অর্থে উৎসবের দিনে ভাগবত পাঠ ও যাত্রার আয়োজন ও সকলের জন্য নদীর ধারে "স্নান-মণ্ডপম্" নির্ম্মাণ

করিতেছে, মহামারীর সময়ে গ্রাম মন্দিরে সহস্র নাম "জপম্" অনুষ্ঠান ও পথে পথে অথর্ব্ববেদ গানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

গ্রাম্য-সভা ও জাতি-পঞ্চায়েত

অব্রাহ্মণ আন্দোলন একটা সহরের মনগড়া রাজনৈতিক আন্দোলন। গ্রামসভায় ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্ব্বাচিত হইয়া সকল বিবাদ মীমাংসা, সকল প্রকার বিধিনিষেধ তৈয়ার করিয়া চলিয়াছে, সমূহ-পণমের ব্যয়প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছে। এমন কি শান্তি রক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক গ্রামে আমি যেমন লক্ষাধিক টাকা গ্রাম্য সভার ভাণ্ডারে মজুত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তেমনি টিনেভেলি জেলায় ইংরাজের পুলিশ অপেক্ষা অপরিজ্ঞাত গ্রাম্য পুলিশের কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভারতের প্রজাতন্ত্র কেবল গ্রাম-সভা ও জাতি-পঞ্চায়েতে পর্য্যবসিত হয় নাই। এখনও বহু স্থানে বিভিন্ন গ্রামের সম্মিলিত সভার অধিবেশন দেখিয়া আসিয়াছি; বাঙ্গালী ইহা বিশ্বাস করিবে না কারণ এ সকল অনুষ্ঠান তাহার বিলুপ্ত, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর এত অহঙ্কার হইয়াছে যে সে আপনার মাপকাটিতে ভারতবর্ষ বিচার করিয়া বসে, সমগ্র ভারতবর্ষকে জানিবার মত তাহার ইচ্ছা ও অধ্যবসায় নাই।

শাসনসংস্কার

মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলের পুষ্টি-সাধন করিয়া, স্থান বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া Regional representation কে আশ্রয় করিয়া প্রজাতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিতেছে। অথচ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ স্থান বিশেষ নহে, অধিকার ও সমাজের বিচিত্র স্বার্থকে (interests and functions) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ ও সমন্বয় সাধন করিতে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র নীরবে নির্ব্বিবাদে সমাজের বিচিত্র স্বার্থ ও অধিকারের একটা সমন্বয় সাধন করিয়া চলিয়া আসিতেছে,

তাহার গ্রাম পঞ্চায়েতে, তাহার বিভিন্ন গ্রামের মহাসভায়, অথবা সহরের বিভিন্ন জাতি পঞ্চায়েতের সম্মিলনে। এক একটি জাতি বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করিয়াও এক একটি জাতি-পঞ্চায়েতের শাসন মানিয়া থাকে; জাতিধর্ম্ম বিষয়ে জাতি-পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আবার পঞ্চ-জাতি গ্রামপঞ্চায়েতে বসিয়া গ্রামের সাধারণ জীবনের জন্য আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিতেও শিখে। পল্লীসমাজে এইরূপ বিভিন্ন জাতির স্বার্থ ও অধিকারের একটা সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। এই প্রজাতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পথ প্রতিরোধ করিয়া মণ্টেগু-চেমসফোর্ড ইহার উপর পুরাতন ইউরোপের পরিত্যক্ত দলবিভাগনীতি-সংবলিত প্রজাতন্ত্র বসাইতেছে, তাহাতে আবার দেশের লোককে প্রজাতন্ত্রের সেই প্রাথমিক স্বত্ব টেক্সস্থাপন ও ব্যয়ের অধিকার না দিয়া। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ আমাদের সম্পূর্ণ নিরর্থক ও বিফল হইবে যদি আমরা ভারতের বিরাট্ পল্লীসমাজের নীরব প্রজাতন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া একটা মুষ্টিমেয় অথচ আত্মম্ভরী প্রগল্‌ভ ও চটুল মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে থাকি।

গঠনের ভাবুকতা চাই

এই বিরোধ ও সংঘর্ষের দিনে আমরা কোন্ পথে যাইব? আমরা এই কথা বহুবার তুলিয়াছি, বহুবার বহুদিক হইতে এক একটা বিষয়ের মীমাংসা করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। এখন সংঘর্ষ আরও জটিল হইয়াছে। এইবার হয় আমাদের শিখিতে হইবে, না হয় মরিতে হইবে। এইবার সব যায়। বাঙ্গালী কূপমণ্ডুকত্ব ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাণের সহিত আপনার সতেজ প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করুক। এইবার গঠনের সময়। বিপ্লবের পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী বসিয়া আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ বিপ্লব-বাদের পুরোহিত ছিলেন। নবযুগের নূতন সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন

মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই বিপ্লবকে এখনও জাগাইয়া তুলিতেছেন; তাই এই গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথের সহিত শিক্ষিত বাংলার আর প্রাণের যোগ নাই। এখন সংস্কার নহে, পুনরুদ্ধারের যুগ। বাঙ্গালী আর কত কাল সেই উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার লইয়া নাড়াচাড়া করিবে? ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের নেতা হইয়াছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আজ বাংলাদেশ নেতৃত্ব পদ হারাইয়া বসিতেছে। গঠন করিবার উপকরণ সেই মৃত্তিকাভিত্তি-বাঙ্গালীর নাই, তাই গঠনবাদে বাংলা আর কিছু দিতে পারিতেছে না। আমার এই পলিপড়া ভূমি, এখানে যে সব ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া যায়, এখনকার দেবমন্দির ইটের, পাথরের নহে, তাই ধ্বংসোন্মুখ, মদুরার সেই পাথরের বিশাল মীনাক্ষীর মন্দিরের মত অতীতের সাক্ষী অমন আর আমাদের কি দেখাইবার আছে, আমাদিগের গ্রাম্য সমাজ আমাদিগের পঞ্চগ্রাম দশগ্রাম শাসন বিলুপ্ত; কি লইয়া আমরা গড়িব? আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ একটা দ্বীপের মত পৃথক হইয়া জনসমাজের সাগরবক্ষে ভাসমান। মারাঠা ভাষার দৈনিক পত্রের গ্রাহক সংখ্যার মত আমাদের বাংলা কাগজের গ্রাহক কোথায়? শিক্ষিত জনসমাজের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের এমন প্রভেদ আর ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই লক্ষিত হয় না। তাই গঠনের শক্তিও আমাদের কুলায় না। রক্ত সংমিশ্রণ বাঙ্গালীকে মানসিক উর্ব্বরতা ও ব্যাপকতা দান করিয়া বিপ্লববাদের উপকরণ যোগাইয়াছে; বাংলার এই পলিপাড়া সমাজভূমি যেখানে কিছুই অচল নহে, গঠনবাদের উপকরণ যোগাইতে পারিবে না।

বাঙ্গালীর ব্যর্থ আশা

তাই এই যুগ বাংলাদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশের দিকে নেতৃত্বের জন্য চাহিয়াছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রে বাঙ্গালী নেতা অপেক্ষা অন্য প্রদেশের নেতাগণ জনসমাজের সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ। সত্যাগ্রহ বাংলার

নেতার মুখে শোভা পায় নাই। কলিকাতার কেরাণীজীবনের সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গালীর চিন্তাকে আক্রমণ করিতেছে। বোম্বাইয়ের সে বিপুল জনহিত-সাধন-প্রয়াস বাঙ্গালীর কোথায়? বাঙ্গালী অর্থ উপার্জ্জন করিতে অপটু তাই বদ্ধজীবনের কলহ ও ক্ষুদ্রতা তাহাকে সবদিক হইতে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। স্ত্রীলোকের পর্দ্দা ও পরাধীনতা বাঙ্গালীর সব চেষ্টার অর্দ্ধেক শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে, মান্দ্রাজের সে সহজ সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ আমাদের কোথায়? স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের প্রভেদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে প্রত্যহ দুঃখময় করুণ নাট্যের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। হীনবল ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী নদীর 'দ' প্রদেশে জন্ম লাভ করিয়া অতিশীঘ্রই বার্দ্ধক্যে উপনীত। অকাল-পরিপক্ক বাঙ্গালীর যৌনজীবনই অতৃপ্তি ও অস্বাস্থ্যদায়ক; তাহাতে আবার সমাজের বিধিনিষেধ যৌন-জীবনকেই প্রশ্রয় দিতেছে। ৩৫ বৎসর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালী যমের ডাক শুনিতে আরম্ভ করে। পঞ্জাবের শৌর্য্য, সে কর্ম্মপটুতা, শুদ্ধি আন্দোলনের সে অসীম সাহস বাঙ্গালীর কোথায়? অথচ বাঙ্গালী ভাবিতেছে, চিরকালই সে নেতাপদে বরণীয়। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের নামের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী আর কত কাল চালাইবে? রসায়নের অকেজো আবিষ্কার বাংলার কৃষি ও শিল্পের সহায় হয় না। বাংলার যুবকসম্প্রদায় অধ্যবসায়হীন, অপরিশ্রমী; আর কোন প্রদেশের যুবকবৃন্দ এমন না খাটিয়া সবজান্তা হয় না। বাংলার সাহিত্যে শুধু প্রেমের ছড়াছড়ি। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরচ্চন্দ্রের কল্পনার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি কুন্দনন্দিনী, বিমলা, কিরণময়ী, কই একটা ত মানুষের মত মানুষের উজ্জ্বল সৃষ্টি নহে। গোরার চরিত্র ত বস্তুতন্ত্রহীন, সন্দীপ একটা সচল বিদেশী বক্তৃতা। আর ইন্দ্র ও পণ্ডিত মশাই তাহারা ত অপরিপক্ক। বাংলার মাসিক পত্রের অস্তিত্ব স্ত্রীলোকের উৎসাহের উপর নির্ভর করে; সমালোচকের মানদণ্ড নহে, বঙ্গনারীর হাতাবেড়ি সাহিত্যের মাপকাটি।

হইয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্য এত চটুল, লঘু সাহিত্য; অথচ জীবন লঘু নহে, অত্যন্ত গভীর, বেদনাময় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলা এখনও ইতিহাস ও পুরাতন সাহিত্য ও পুরাণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে; বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ ও বেদনার সহিত তাহার সংযোগ খুব কম। আর নাট্যকলা, তাহার প্রাণ শুধু বিলাসভোগ; জীবনের বিপুল সংঘর্ষ ও বেদনা আমাদের নাট্য সাহিত্যে প্রকাশ পায় না। আমাদের উচ্চশিক্ষা দেশের অন্নসংস্থানের সুযোগ দান না করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের মত অকেজো চাকুরীর কাঙ্গালী তৈয়ার করিতেছে, অথবা সত্যসন্ধানের নামে অকেজো গবেষণার প্রশ্রয় দিয়া বাঙ্গালীকে যশের কাঙ্গালী করিতেছে। বিশ্বজগতে নূতন শিক্ষার প্রধান পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও জাতীয় আদর্শের সহিত নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপনে। আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের জীবনের ও আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আনিতে পারিতেছে না, লোকচৈতন্যের সহিত উচ্চশিক্ষার এমন চরম বিরোধ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। বিলাতের স্থানীয় শিল্পের উন্নতির ও প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা স্যাড্‌লার সাহেব বাংলায় আবহাওয়ায় আসিয়া মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্থানীয় কৃষি শিল্পের উদ্ধারের জন্য চরম আবশ্যকতা বুঝিলেন না।

কত কল্পনা ভাবুকপ্রধান বাঙ্গালীর হৃদয়ে জলবুদ্বুদের মত উঠিয়াছে, মিশিয়াছে; কত কর্ম্মের আয়োজন ব্যর্থ আশা বুকে করিয়া স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া গিয়াছে। বৈশাখের রৌদ্রপীড়িত গঙ্গাচরের মত বাঙ্গালীর হৃদয় আজ কাতর। "হান তব বাজ হৃদয় গহনে," চাতকের মত যে জল ভিক্ষা করে সে বিদ্যুতের আগুনে ভয় পায় না। ব্যর্থ আশা, বিফল মনোরথ পূরণ করিবার জন্য আমরা আবার নূতন করিয়া গড়িব। এইবার আমরা আমাদের বিধিদত্ত ও সমাজদত্ত প্রকৃতির সহিত বুঝিয়া

নূতনের সূচনা করিব। আর পলিপড়া ভূমির মত গলিয়া ধসিয়া যাইব না, শ্রাবণ-প্লাবনের বেগ আমরা মস্তকে বরণ করিব, চক্ষে অভিসার রজনীর নিবিড় অন্ধকারের কজ্জল এবং ভালে চির-নবীন পঙ্কতিলক ধারণ করিয়া, ব্যর্থ আশার জীর্ণকন্থায় কটিমাত্র আচ্ছাদিত হইয়া। আমরা শ্যামায়মান বনান্তরালে স্থাণুশুভ্র প্রস্তরবেদীর উপর নব নীরদ-শ্যাম বিদ্যুতের চূড়া পড়িয়া চির-কিশোরের লীলা দেখাইবে। বাংলার প্রাণবন্ত শ্যাম যে "নিতুই নব", এবার এই "নিতুই নবে"র মধ্যে যে চিরপুরাতন তাহাকে বাংলার চির-কিশোর প্রাণ বরণ করিয়া লইবে।

ভারতের প্রজাতন্ত্র কোন পথে যাইবে ?

বিশ্বজনীনতা

বিশ্বমানবের পূজামণ্ডপে বিশ্ব-দেবতার নিত্য আরতির জন্য সকল জাতিই আহূত হন। দুর্ব্বল, সবল, হীন, অর্ব্বাচীন সব জাতিই মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সেই সান্ধ্য পূজার আয়োজনে যোগদান করেন। এ পূজায় সকল জাতির স্বতন্ত্র সাধনা সম্মিলিত। কোনও একটী বিশিষ্ট জাতির সাধনা সার্থক হইলেও বিশ্বদেবতার চক্ষে তাহা একটি উপকরণ মাত্র।

প্রত্যেক জাতিই তাহার ইতিহাসের অভিব্যক্তি দ্বারা তাহার বিশেষ আবেষ্টনে যে বিশিষ্ট ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহার অভাব হইলে বিশ্ব-দেবতার পূজা অঙ্গহীন হইবে। পাঁচটী প্রদীপ একসঙ্গে জ্বালা চাই, এক প্রদীপে দেবতার আরতি হয় না। আলোক রেখার একটী রশ্মির অভাব হইলে, সে রেখা নিষ্প্রভ।

রাষ্ট্রীয়তা

জাতিগত সাধনার বিশিষ্টতা রক্ষামন্ত্র আজ যুদ্ধের পর শান্তি সভায় উচ্চারিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তার যে আন্দোলন ইউরোপ এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহা Right of self determination, জাতির আপনার ইতিহাস আপনি গঠন করিবার স্বত্বের আন্দোলনে পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে যাহার ফল অনুমান করা আপাততঃ ধারণার অতীত। একদিকে যেমন এক একটী জাতি তাহার আপনার বাসভূমিতে আপনার সভ্যতা বিকাশের অধিকার

স্থাপন করিয়াছে অপর দিকে দেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত কোন বিশিষ্ট জাতি জাতি ও গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার জন্য রাষ্ট্রবিপ্লব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্ব-জাতি-মণ্ডল (League of Nations) জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের গঠন ও স্বাধীনতাকে উৎসাহ দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সেই পূর্ব্বান্দোলনকে সজীব রাখিতে তৎপর, এমন কি ইতিহাসকে তিরস্কার করিয়াই পোল্যাণ্ড, যুগোস্লেভিয়া প্রভৃতি নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কাগজে কলমে সৃষ্টি করিয়াছে। এই সৃষ্টি টিকিবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভে তুষ্ট না হইয়া যে বিজিগিষু হইয়াছিল তাহাতেই সর্ব্ব জাতি-মণ্ডলের হঠকারিতা প্রতীয়মান এবং আজ যে রুশিয়ার অভিযান, তাহার ফল কি হইবে তাহা সর্ব্বজাতি-মণ্ডলও জানে না। তাহা ছাড়া অষ্ট্রীয়া ও তুর্কীর ধ্বংসে এবং রুষিয়ার ভাঙ্গাগড়া হইতে নানাজাতি সুযোগ লাভ করিয়া সর্ব্ব-জাতি-মণ্ডলের পরিপোষণে স্বাধীন রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছে। সমগ্র ইউরোপে প্রায় এখন ত্রিশটী স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশ হইল।

বাস্তবিক এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই যে বড় যুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে দুইটী বিপরীত শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। অনেকগুলি ছোট ও খণ্ড রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা অথবা এক কেন্দ্রস্থ প্রভু-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের সমাবেশ, ইউরোপের রাষ্ট্র-গঠনের এই দুই বিরোধী অন্তর্নিহিত শক্তি গত শতাব্দীতে যে কঠিন সমস্যা আনিয়াছিল, তাহারই একটা মীমাংসা আপাততঃ গত যুদ্ধে হইল। এথেন্সের প্রজাতন্ত্র যেমন অতীত-কালে কবসাইরাকে আশ্রয় দিয়াছিল তেমনি এই যুদ্ধেও বিভিন্ন রাজ্যের মিত্রতা স্থাপনে একই প্রকার রাষ্ট্রগঠন প্রণালীর সমাবেশ দেখা যায়। খণ্ড রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অথবা সমষ্টির অধিকার দুইই রাজ্য গঠন ও বিকাশের সহায়। এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের মীমাংসা যে নির্ভুল অথবা চিরন্তন হইল তাহাও নহে। কিন্তু এটা ঠিক টিউটনীয়দিগের সেই মিটেল ইউরোপার

স্বপ্ন এখন বিলীন হইল। সমগ্র ইউরোপ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হউক না কেন, অথবা League of Nations নিরাকার ব্রহ্মের মত নির্ব্বিকার এবং তাহার উপাসক উইলসন সাহেব ধ্যানযোগে নির্ব্বিকল্প হইয়া থাকুন না কেন।

জাতীয়তা

সর্ব্বজাতি মণ্ডল দ্বিতীয় আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয় নাই। জাতিধর্ম্মের বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় আন্দোলন রাষ্ট্রকেও বিকাইয়া দিতে পারে বলিয়া উহাকে কেহ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। পূর্ব্ব ইউরোপের তুরানীয়েরা মাথা তুলিয়াছে। বুলগেরিয়ার অধিবাসীগণ শ্লাভদিগের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ম্যাগিয়ারগণ আপনাদিগকে ইউরোপীয় মনে করিতেছেন। তুর্কীগণ ধর্ম্মের দোহাই ছাড়িয়া তুরানীয়দিগের সহিত মিশিতেছে। রুষিয়ার ফিনগণ তাহাদের খণ্ড রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট; দক্ষিণে তাতারগণ সত্তরলক্ষাধিক তাহারা, মস্কোর অধীনতা মানিতে চাহে না। মধ্য-এশিয়ার তুর্কমানগণও সত্তরলক্ষাধিক, তাহারাও জাত্যাভিমানে মত্ত হইয়া অন্য তুরানীয়দিগের সহিত যোগদান করিয়া বিষম বিভ্রাট বাধাইতে পারে। পশ্চিম এসিয়ায়, সিরিয়া ও ইজিপ্ট দেশে আরব-জাতি খিলাফতের প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে তৎপর হইয়াছে। আরব জাতির নেতাগণের মধ্যে কেহ কেহ কেবল আরব দেশে, সিরিয়া মেসোপটেমিয়া লইয়া সন্তুষ্ট নহেন; উত্তর আমেরিকা ও সুদূর সুডান পর্য্যন্ত ঘিরিয়া এক প্রকাণ্ড আরব সাম্রাজ্য তাঁহাদের কল্পনায় ভাসিতেছে।

সকল ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-ধর্ম্মের এক প্রচণ্ড বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত, তুরানীয়, মঙ্গোলীয়, আরবীয়, মধ্য-ইউরোপীয় ও মধ্য-এসিয়া সংক্রান্ত আন্দোলন সবই রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ-নীতিকে সংশোধন

করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। ইউরোপ নহে, এশিয়া এই দুই আন্দোলনের বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। ইহার মীমাংসা হইতে পারে কিনা তাহাই এক্ষণে আমাদের আলোচ্য।

রাষ্ট্রের গঠন-নীতি

ধর্ম্ম ও জাতীয়তার মাপ কাঠী কিংবা কূট-নীতির বিচারের দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা হয় না। ভাষা, ধর্ম্ম অথবা জাতি, শ্রেণী এক হইলে রাষ্ট্র যে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে অথবা আধুনিক প্রবল দেশ সমূহের সুবিধা ও অসুবিধানুসারে রাষ্ট্র যে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে হইবে এ বিচার নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক, জগতের অকল্যাণকর। একটা নূতন সভ্যতার বীজ যেখানে আছে সেখানকার মাটী খুঁড়িয়া ফেলিয়া যদি বীজকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে বৃথা পণ্ডশ্রম, বৃথা মানুষের ক্লেশ। কারণ সেই সভ্যতা আপনার মনোমত রাষ্ট্র ও সমুদায় সমাজিক অনুষ্ঠান অনুকূল আবেষ্টনে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবেই, আপনিই একীকরণ বা পৃথককরণ-শক্তি জাগ্রত হইয়া সেই সভ্যতা গঠন ও বিকাশের মাল-মসলা যোগাড় করিয়া লইবে।

তাই এই সকল বিষয়ে ধর্ম্ম, ভাষা, অথবা কূট নীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া ভিতরকার সভ্যতার নিগূঢ় ও অদম্য শক্তি অনুসন্ধানের জন্য ভৌগোলিক (Regional) এবং জাতির ও সমাজের ক্রম বিকাশ-গত ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন জাতির সমাজিক ইতিহাস এবং জাতীয় মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের বিচিত্র প্রকৃতি

দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক ইতিহাস ও তুলনামূলক মনস্তত্ত্বের জ্ঞান আমাদের নাই বলিলেও হয়। এতকাল রাষ্ট্রের ভাঙ্গা গড়া অন্ধ প্রকৃতির সেই অনধিগম্য নিষ্ঠুর ক্রিয়া অথবা কয়েকটি প্রবল জাতির

সুবিধা ও অসুবিধার উপর নির্ভর করিয়াছে। এই যুদ্ধের পর মানুষ সত্যসত্যই রাষ্ট্র ও সমাজ এমন কি ইতিহাসকেও বিজ্ঞান ও আদর্শের সঙ্কেতে গড়িয়া তুলিবার আশা পোষণ করিতেছে। এই আশা কিন্তু ব্যর্থ হইবে, যদি পাশ্চাত্য জাতিসমুদায়ের রাষ্ট্র ও সমাজের মাপ কাঠি অবলম্বনে আমরা বিশ্বজগতের রাষ্ট্র ও সমাজকে বিচার করিতে বসি।

রাষ্ট্র জিনিষটা যে জাতি, সামাজিক ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দেয় তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই।

ইউরোপে রাষ্ট্র যে এক্ষণে এক সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বভূক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার সে প্রকৃতি প্রাচ্যখণ্ডে দেখা যায়না কিন্তু ইহার ইতিহাস জার্ম্মানীর সেই নিবিড় অরণ্যে যেখানে প্রথম টিউটনীয় প্রজা-তন্ত্রের সূত্র-পাত হয়, সেইখানে আরম্ভ।

রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান

জাতিতে জাতিতে অনন্ত যুদ্ধ বিপর্য্যয়ের মধ্যদিয়া যখন ইউরোপীয় সভ্যতা রোমের কলেবর বৃদ্ধির সেই বিরাট অয়োজনের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিল তখন রাষ্ট্র অথবা আইন কানুন, স্বাধিকার অথবা নীতি উপনিবেশ অথবা সাম্রাজ্যের আদর্শ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিপুল বিস্তার চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। রোমের সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র পাশ্চাত্য ইতিহাসের মূল ও আদর্শ হইয়াছে। গ্রীস যেমন ইউরোপকে কলা ও দর্শন দান করিয়াছে, রোম আরও নিবিড় ভাবে রাষ্ট্র-গঠন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ নির্ণয় করিয়া ইউরোপের কর্ম্ম রাশি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যখন ইউরোপ বর্ব্বরতায় আচ্ছন্ন হইল তখন জার্ম্মাণীর অরণ্যে টিউটনগণ যে প্রজাতন্ত্রকে বিকাশ করিতেছিল

তাহাই রোমের হাতে অঙ্কিত হইয়া সমগ্র ইউরোপময় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

যুদ্ধের ভিতর দিয়া যে সমাজের অভ্যুত্থান তাহাতে রাষ্ট্র অনতিক্রম্য শক্তির আধার হইয়া শেষে মানুষের জীবনের সবদিকই নিয়ন্ত্রিত করে; পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম অথবা যাবতীয় শ্রেণী সমূহ রাষ্ট্রের, রাজার অথবা যুদ্ধনায়কের শক্তির নিকট আত্ম সমর্পণ করে। এবং সমাজের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার অসাম্য ও অনধিকারেরও সৃষ্টি হয়—যেমন (ক) দাসত্ব প্রথা (খ) জাতি বিশেষে সামাজিক—স্তর বিভাগ (গ) স্ত্রীলোকের অধীনতা (ঘ) যোদ্ধ বিভাগের প্রভুত্ব, ক্ষাত্রধর্ম্ম, বুশিডো অথবা চিভেলরির প্রতিপত্তি এবং (ঙ) বিজিতগণের জমি কাড়িয়া লইয়া রাজন্য ও জমিদারবর্গের অভ্যুত্থান। ল্যাটীন ও টিউটন জাতি অল্পবিস্তর সামাজিক স্তর বিভাগ সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের অধিকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে বণ্টন করিয়া চিরকালই একটা শ্রেণী বিরোধের উপকরণ যোগাইয়াছে। এই শ্রেণী-বিরোধই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ইউরোপের যত কিছু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পতন অভ্যুত্থান। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় জাতি সমুদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমা প্রকাশ। বৈষয়িক উন্নতি এই শ্রেণী বিরোধকে প্রবলতর করিয়া ক্রমাগত একটা উত্থান-পতনের চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা, অভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তনবাদ (Evolution) বিরোধকেই জীবের জীবন উন্নতির একমাত্র পন্থা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে; এবং এই বিবর্ত্তনবাদ রাষ্ট্র ও সমাজ, অথবা বৈষয়িক জীবন ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রেণীবিরোধকে উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও শ্রেণীবিরোধ

কিন্তু জীবজাতির উন্নতি যে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা ও বিরোধের মধ্য দিয়া হইয়াছে তাহা নয়। জীবের সহিত জীবের সহযোগিতা ও সাহচর্য্য অনেকদিক হইতে তাহার উন্নতির সহায় হইয়াছে। ক্রোপাট্‌কিনের ইহাই প্রনিধান বস্তু ছিল, কিন্তু ক্রোপাট্‌কিনের বিজ্ঞান-সম্মত বিচার কেহ শুনে নাই। সমাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রের বিকাশ ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবনের অভিব্যক্তি ডারুইনের অনুযায়ী মতান্তরে ইউরোপে বিপরীত ধারা অবলম্বন করিয়াছে। তাই বিরোধ ছাড়িয়া সমবায়কে জীব বিজ্ঞান অথবা সমাজ বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে নাই। আজিকার এই শ্রেণী বিরোধের দিনে (Centre Party) কেন্দ্রবর্ত্তী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা, ধনী অথবা শ্রমজীবীর সমূহ-তন্ত্রের কথা উঠিলেও সে কথা দলাদলির এবং ধর্ম্মঘটের চীৎকারে কেহ শুনিতে পায় না।

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ Parliament শাসন-প্রণালী আবিষ্কারের দ্বারা এই বিরোধকে প্রজাতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। পুরাতন গ্রীসের শ্রেণী-বিরোধ (Stasis) প্রজাতন্ত্রের প্রধান শত্রু ছিল। আরিষ্টট্‌ল এই শ্রেণীবিরোধ নিবারণ পন্থা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরিষ্টট্‌লের সেই আদিমকালের উপদেশ আজও এই শ্রেণী বিরোধের যুগে বিশেষ প্রযোজ্য। গ্রীসের সেই আদিম ধনী নির্ধনের সংঘর্ষ, রোমের সেই প্রচণ্ড শ্রেণী বিরোধ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব তখন নূতন আকার গ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সের Syndicalism অথবা শ্রেণীতন্ত্র ইংলণ্ডের শ্রমজীবি আন্দোলন, পূর্ব্ব ইউরোপে কৃষক-আন্দোলন, Bolshevism অথবা চরম-তন্ত্র সবই ধনী নির্ধনের বিরোধকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রের অনুষ্ঠানকে বিবিধপ্রকারে আধুনিককালে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

সকল পাশ্চাত্যদেশে শিল্প ও শ্রম বিষয়ক আইনকানুনের প্রকৃত কর্ত্তা

রাষ্ট্র নহে, এই সকল বিষয়ে যাবতীয় আইন শ্রমজীবী-সংঘ এবং তাহাদিগের নেতারাই তৈয়ার করিতেছেন, Parliamentএর নেতারা নহে। এই হিসাবে Parliamentএর যাহা প্রাণ সেই দলাদলি-নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপ সংযোজন বা সংমিশ্রন নীতিকে আশ্রয় করিতেছে। দল-বিভাগ নয়, দলমিশ্রনের দিকে ইউরোপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই সম্মিলিত দলের দ্বারা এক্ষণে শাসিত। পাশ্চাত্য জগৎ এখন বিরোধের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া জোট বাঁধিয়া শান্তিজল ঢালিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ইউরোপ যে দলবিভাগ-নীতি পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে সেই দলবিভাগ মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের শাসন সংস্কারের নাম ভাড়াইয়া ভারতবর্ষে আজ জুড়িয়া বসিতেছে। দেশীয় মন্ত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আমাদিগের শাসন সভার সদস্যগণের মধ্যে দল-বিভাগকেই আশ্রয় করিবে। দল-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান দোষ প্রকটিত হয়, যখন ইহা অর্থের স্তরবিভাগের সহিত মিলিত হইয়া হিংসা ও দ্বেষকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এই দোষ যাহা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে আপাততঃ প্রকটিত হউক বা না হউক দল-বিভাগ বলিলেই আমরা অধিকতর ভোটের দ্বারা শাসন বুঝি। যাহারা সংখ্যায় কম তাহাদের মতামত অনাদৃত এমন কি উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্র ক্রমে একটা বিরাট কলে পর্য্যবসিত হয় এবং সমগ্র দেশের যাবতীয় সংঘ সমূহকে পিষিয়া ফেলিয়া কলের অনুযায়ী ভোট গুণানির জন্য দেশকে কতকগুলি কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করে। প্রজাতন্ত্র জাগিয়া উঠে সেই একবার ভোট দিবার সময়ে দলাদলির চীৎকারে সেই কৃত্রিমবিভাগ গুলায়। অন্য সময় প্রজাতন্ত্র নিতান্ত কর্ম্মবিমুখ। রাষ্ট্র যাহা বলিবে প্রজা তাহা করিবে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রেও। শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তা মেরামত প্রভৃতির জন্য লোকেরা সেই রাজধানীর অর্থও কর্ম্মকুশলতার

প্রত্যাশী। প্রজাতন্ত্র দল-বিভাগকে অবলম্বন না করিয়া, মাথা—গুণানিকে আশ্রয় না করিয়া, যে চলিতে পারে, ইহা পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতায় নাই। ভারতবর্ষের আর এক প্রকার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠন ও সংস্কারের নিয়মই এই যে দেশের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে না মানিলে বিফলতা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্টতা

আমাদের মনে হয় এই নূতন সংস্কার দেশের অতীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যৎকে নিতান্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র আর এক বিপরীতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা এইবার বলিব। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রের সহিত সেই আদিম ও স্বাভাবিক সমূহ-তন্ত্রের (Communalism) নিবিড় সম্বন্ধ।

সেই আদিম দ্রাবিড়ী-সম্ভূত সমাজ বিন্যাস ও রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও আমরা ভারতবর্ষের তথা কথিত পতিত জাতি ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সুদৃঢ় পঞ্চায়েত, গ্রাম সভার প্রামানিক বা মণ্ডল ও কর্ম্মচারী ও বিভিন্ন শিল্পী, চৌকীদার, গবাইত ও ভৃত্যগণের সমাবেশ দেখিতে পাই। বিবিধ গ্রামপঞ্চায়েতের সংযোজনে যে সভা গঠিত হয় তাহার অধিপতি একজন বড় মণ্ডল। প্রত্যেক গ্রামের ছোট মণ্ডল তাঁহার অধীনে থাকিয়া গ্রামের সকল কার্য্য গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বসিয়া তত্ত্বাবধান করেন। জাতি অনুসারে সেই পুরাতন পরগণা বা পট্টিবিভাগ সম্মিলিত সর্দ্দারগণের শালিশ সভা এবং নিম্ন জাতিদিগের জননায়ক, রাজার শাসনপ্রণালী এখনও অনেক স্থানে বিদ্যমান। কিন্তু এইপ্রকার সমাজবিন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির পরিচয় পাই, ভারতবর্ষের জাতি পঞ্চায়েত সমুদায়ে, পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম অথবা শতগ্রামের

শাসনে, আমাদের পল্লীসমাজের সমূহ-তন্ত্রে। গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য চৌকীদারকে, কৃষিকর্ম্মের সাহায্যের জন্য ছুতার, কামারকে, গ্রামের খাল পরিষ্কার ও জলসেচনের জন্য সাধারণ ভৃত্য প্রভৃতিকে জমি দেওয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই যেখানে দেশীয় প্রাচীন অনুষ্ঠান-গুলি পররাষ্ট্রের নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া লুপ্তপ্রায় হয় নাই, সেখানেই এই প্রকার সমাজবিন্যাস ও শাসন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ যেখানে দ্রাবিড়ীজাতির প্রাধান্য সেখানে ইহা সুস্পষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সভায় জননায়ক কর্ত্তৃক বিবাদনিষ্পত্তি ও গ্রামকার্য্য পরিচালন, গোচারণ মাঠ, পতিতজমি খাল জঙ্গল প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের স্বত্বপ্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যসভা সমুদায়ের সমবায়ে দশগ্রাম, শতগ্রাম প্রভৃতির সামাজিক শাসন শুধু যে দ্রাবিড়ী সভ্যতার পরিচায়ক তাহা নহে, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতিতে আর্য্যজাতি ও শ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সমুদায়েও এই প্রকার ব্যবস্থাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সবদিকেই অপরিচিত প্রবলতর জাতি অথবা শিল্পী কৃষাণদিগের সমাগমে গ্রামের প্রকৃতি হয়ত কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রাম্য সভার স্বাধীনতা, ও কর্ম্মকুশলতা, বিভিন্ন গ্রাম লইয়া একটা বৃহত্তর সামাজিক জীবন আজও বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমান-জায়গিরদার, মহারাষ্ট্রীয় দেশপাণ্ডে, রাজপুত ঠাকুর, শিখ সর্দ্দার, ইংরাজ তহশিলদার গায়ের অথবা আইনের জোরে গ্রামের বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া গ্রাম্য সমাজের সমূহ তন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, গ্রাম্য সমাজের খাজনা সম্বন্ধে সমূহ দায়িত্বকে অস্বীকার করিয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীর সহিত স্বতন্ত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া সমূহ-কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিয়াছে, তবুও সেই সমূহ-বোধ আজও বিলুপ্ত হয় নাই। বাংলা দেশে যাহা এখন লুপ্তপ্রায়, দক্ষিণে উত্তরে তাহা সমাজসংস্কার ও অধিকাংশ স্থলেই গ্রামবাসীর সমবেত খাল, কূপ, মন্দির, পাঠশালা, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের ব্যবস্থায় প্রকাশ পাইয়া

তাহাদের গ্রাম্য সভায় তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, বিচিত্র প্রকার কর, বৃত্তি আদিয়াই স্থাপন করিয়া সাধারণ ভাণ্ডার অথবা সমূহ পণ্য পূর্ণ করিয়া লয়, নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েতে বসিয়া সকলপ্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে। এই সিরিজের আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি টিনাভেলী ও তানজোর জেলার এইপ্রকার সমূহ কর্ম্মের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার সবিশেষ বিবরণ এই পুস্তকে দেখিবেন।

Decentralisation Commission এর উপদেশ সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিল পাশ হইলেও আমার মনে হয় দেশের পুরাতন ও স্বাভাবিক গ্রাম্য ও জাতি সমূহ-শাসনের কিছুই সদ্ব্যবহার হয় নাই। আর প্রজাতন্ত্রের এই দুর্দ্দিনে, এই বিপরীত দলবিরোধের যুগে যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা বিশিষ্টতা আছে, তাহা বুঝিলে শুধু যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহা নহে, পাশ্চাত্যের প্রজাতন্ত্রে যে শ্রেণীবিরোধ রুশিয়ায় রাষ্ট্র বিপ্লবের সহিত প্রবলভাবে এখন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারও একটা মীমাংসা দেখাইতে পারিব। আমাদের গ্রাম্য সভা সমুদায়ের সম্মিলন ও সমবায়ে এমন একটা Peasant Democracy গড়িয়া উঠিতে পারে যাহা আমাদিগকে মণ্টেগু-প্রচারিত বিদেশী প্রজাতন্ত্রের কৃত্রিমতা হইতে শুধু রক্ষা করিবে নহে, ইহা রাষ্ট্রীয়জীবনে বিরোধের পরিবর্ত্তে মিলন, হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর বাণী বহণ করিয়া জগতেরও কল্যাণ আনিয়া দিবে।

ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজে, সমূহ, শ্রেণী প্রভৃতিতে যে প্রজাতন্ত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাতে শ্রেণীবিরোধ জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রাম্য সমাজের পঞ্চায়তে সকল জাতিই তাহাদের স্বার্থ সঙ্কুচিত করিতে শিখিয়াছে। শিল্পিগণের শ্রেণীতে বিভিন্নজাতি তাহাদের সাধারণ ব্যবসায়ের মঙ্গলের জন্ত নিজ নিজ বিশিষ্ট স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছে।

এইপ্রকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছে বিভিন্ন গ্রাম্য পঞ্চায়তের সম্মিলনে, বিভিন্ন শ্রেণী সমুদায়ের একত্র সমাবেশে। পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্রের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্বের নিকট সকল স্থানীয় অথবা সামাজিক গোষ্ঠী সমুদায় আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়াছে। ভারতবর্ষের সমুহ-তন্ত্রে শ্রেণী, পুগ অথবা গোষ্ঠী সমুদায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতবর্ষের আত্মা একটা সামাজিক সাম্য, একটা কর্ম্মকুশলতাকে উৎসাহ দান করিয়া প্রজাতন্ত্রের অটুট ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছে। রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ভূরি পরিমাণে সঞ্চারিত হওয়াতে চীন ও ভারতবর্ষে এমন একটা নীরব ও কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার সহিত চটুল ও কলহপ্রিয় পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের আকাশপাতাল প্রভেদ।

সমূহ তন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সমুদায়ের সজীবতা একদিকে যেমন সর্ব্বভূক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বেড়জাল বিস্তার প্রতিরোধ করিয়াছে, অপরদিকে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রমত্ততাকে নিবারণ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনিয়াছে। শ্রেণী বিরোধ নিবারণ করা হইয়াছে আর একপ্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় সমিতিতে, গ্রাম অথবা শিল্পের সাধারণ উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিয়া জাতি ও শ্রেণীর বিরোধের মীমাংসা হইয়াছে। হইতে পারে আমাদের দেশে ও চীনরাজ্যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-শক্তির অভাব পরাধীনতা ও পরপীড়নের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সমূহ-শক্তি অটুট থাকায় এইপ্রকার রাষ্ট্রের যে বিকাশ নাই তাহা অসম্ভব। বরং দেশের প্রাকৃতিক শক্তি ও জাতির সামাজিক আদর্শের অনুযায়ী এইপ্রকার রাষ্ট্রকেই অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বপ্রতিষ্ঠা (Politi-

cal self determination) বিদেশী ধাতের প্রজাতন্ত্রকে এশিয়ার ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিয়া এশিয়াকে স্বাধীন হইতে বলিলে স্বপ্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মে। একদিকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের সভ্যনির্ব্বাচন সম্বলিত পরোক্ষ প্রজাতন্ত্র হইতে আমাদিগকে নির্ব্বাচিত সভ্যের দায়িত্ব বোধ শিখিতে হইবে। অপরদিকে আমাদের স্বাভাবিক ও পুরাতন প্রত্যক্ষ প্রজাতন্ত্রের স্বাভাবিক উন্নতি ও প্রসার হইবে, সমবায় ও সম্মিলনের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী, সমিতি, গ্রাম্যসমাজ, মণ্ডলী প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট রাষ্ট্র সমবায়ে। এমন একটা রাষ্ট্রীয় সমবায় গাড়য়া তুলিতে হইবে যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী, সমাজ ও সমূহের স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম্মকুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র সমুদায়ের সমবায়ে একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি বিকাশলাভ করিয়া প্রত্যেকের স্বধর্ম্মপালনের সুবিধা, প্রত্যেকের বৃত্তি-বিপ্লবে নিবারণ হইতে পারে। মানুষের ও সমাজের স্বাভাবিক বৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি বিধান করিয়া এমন সব গোষ্ঠীর বিকাশসাধন করিতে হইবে যাহাতে মানুষ রাষ্ট্রীয় কলের অধীন না হইয়া আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তৎপর হয়। এই ধরণের আদর্শ ইউরোপে আজকাল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ চিরকাল ইহাই। ইউরোপে এই আদর্শ কিরূপে রাষ্ট্রীয়গঠনে পরিণত হইতে পারে, আমাদের আদর্শ কিরূপে পাশ্চাত্যের নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ এইবার আলোচনা করিব।

নব্য-প্রজাতন্ত্র ও ভারতের সাধনা

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নব্যবিকাশ

পাশ্চাত্য জগতে যে নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ পরিস্ফুট হইতেছে তাহাদের মধ্যে সকলেই—রাষ্ট্র যে সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বশক্তিমান হইয়া এক্ষণে প্রজার ও নানাবিধ সমূহ-অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিতেছে তাহার প্রতিরোধ করিতে চাহে।

রাষ্ট্রকে সামাজিক আদর্শ ও বিকাশের একমাত্র নিয়ন্তা করিলে এমন একটা ঔদাসীন্য প্রশ্রয় পায় যাহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমাজের কর্ম্ম-কুশলতা খর্ব্ব হইতে থাকে। পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্র আজ বুঝিতে পারিতেছে যে প্রজাকে সজাগ রাখিতে হইলে তাহাকে ভোটের সময় এক পক্ষ না হয় অপর পক্ষের সহিত হাঁ বা না বলাইলে শুধু চলিবে না। প্রজাকে স্বাধিকার দিতে হইবে। প্রজার জন্য স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রের যাঁহারা প্রধান সমালোচক তাঁহারা সকলেই নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে যত্নবান। অধিকাংশ চিন্তাশীল লেখকগণ শ্রেণীকেই কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন। শ্রমজীবীদিগের নানা শ্রেণী একতা ও সমভাব দেখাইয়াছে। শ্রেণী-স্বার্থ সদা জাগরূক। সভ্য নির্ব্বাচনের সময় কতকগুলি দেশ বিভাগ, কখনও শ্রেণী সংঘের মত স্বাভাবিক ও সমগ্র জীবনের পরিচায়ক নহে। তাঁহারা বলেন কৃত্রিম দেশ বিভাগ উঠাইয়া দাও। শ্রেণীকেই নির্ব্বাচনের কেন্দ্র কর।

শুধু নির্ব্বাচনের আধার নয় শ্রেণীকে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রধান কেন্দ্র করিতে হইবে, তাঁহারা বলিতেছেন। এক এক শ্রেণী-চৈতন্য অসংখ্য সমূহ-শাসনে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেশময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে একটা দক্ষ স্বায়ত্ত-শাসন গড়িয়া তুলিবে। এবং কৃত্রিম বিভাগ নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়া পার্লা-

মেণ্ট দেশের সকল প্রকার গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের পরিচয় দিবে। শ্রেণী, গুণ ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য সভ্য নির্ব্বাচনের সময় রক্ষা না হইলে প্রজাতন্ত্র অঙ্গহীন থাকিবে।

রুশিয়ায় সোভিয়েট অবলম্বিত প্রজাতন্ত্র অন্য এক বিপরীত নীতিকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডে অথবা ফ্রান্সে যে সকল প্রজাতন্ত্র সংস্কারের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে সকলেই শ্রেণী-চৈতন্য (class-consciousness) কে আশ্রয় করিয়া বৈষয়িক জীবনের বিরোধকে রাষ্ট্রীয় গঠন প্রণালীর উপকরণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই ফ্রান্সের শ্রেণী-তন্ত্র (Syndicalism) এবং ইংলণ্ডের শিল্পত্রয়-সম্মিলন (Tripple Industrial Alliance) "direct-action" অথবা সহজ ও প্রচণ্ড বিরোধের দ্বারা রাষ্ট্রকে খর্ব্ব করিবার আন্দোলনকে সজাগ রাখিয়াছে।

অধুনাতন প্রজাতন্ত্রের প্রধান নায়ক, লয়েড্ জর্জ্জ অথবা মিলারা এই শ্রমজীবীসংঘের হঠকারিতা ও বিপ্লব-প্রবৃত্তিকে প্রজাতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অথচ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের ক্রম-বিকাশে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণীবিরোধ-প্রসূত বিপ্লববাদকে একটা অস্বাভাবিক স্বার্থপরতার প্রক্রিয়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার নয়।

প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ রুশিয়ায় বিকাশলাভ করিতে পারে না। একটা প্রধান কারণ এই যে রুশিয়ায় বড় বড় কারখানা এবং মূলধনের অথবা ধনীর বৈষয়িক জীবনে প্রতিপত্তি তত নাই। বিভিন্ন গ্রামের বিচিত্র স্বাধীন সঙ্ঘের সমবায়ে রুশ কৃষক-প্রজাতন্ত্রের (Peasant democracy) আধুনিক অভ্যুত্থান।

এই নূতন প্রজাতন্ত্রের নূতন গঠন প্রণালী ও শাসনরীতি কেহ কেহ বলিতেছেন জগতে এক যুগান্তর আনিবে। এই নূতন প্রজাতন্ত্র রুশিয়ার বহু শতাব্দীর পুরাতন সেই গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে স্থাপিত এবং ইতালীর

রাজনীতিক কাভুর যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, যে রুশিয়ার গ্রাম্য সমাজ পৃথিবীর শাসন-প্রণালীর যে একদিন যুগান্তর আনিবে তাহা নিতান্ত অলীক নয়। রুশিয়ার মীর অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত চিরকালই স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র ছিল। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জমি সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া, সকলের উপর সঙ্গত ভাবে কর স্থাপন করা, গ্রামের নানা প্রকার বিবাদ মামলা মিটাইয়া দেওয়া, ইত্যাদির ভার এই মীর অথবা গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের উপর এখনও ন্যস্ত আছে।

এই প্রকার স্বায়ত্তশাসন সমগ্র স্লাভদেশে, চীন ও ভারতবর্ষে বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি আয়ার্ল্যাণ্ডে 'সিন্ ফিন-তন্ত্র' এই প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের পুনর্জ্জীবন দিয়া সেখানকার রাষ্ট্র বিপ্লবকে এত সহজ করিয়াছে।

রুশিয়ার এই মীর পরস্পরের মিলনে সহযোগে প্রসার লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি গ্রাম্য-পঞ্চায়েত ক্রমশঃ এইরূপে জেলা সহর ও প্রাদেশিক সমিতি ও সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

চরমপন্থী "বলসেবী"গণ রুশজীবনের এখন ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু অনুধাবনের বিষয় এই যে, যে রাজনৈতিক দলই এখন প্রভুত্ব করুক না কেন, শাসনযন্ত্রের মূল চক্রই হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যসমাজের সমাবেশ। সেই চক্র এখন কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা এতদূর হইতে এখন বলিতে পারা যায় না।

সোভিয়েট অথবা সমূহ তন্ত্রের মূল-শক্তির কারণ এই যে ইহা শ্রমজীবি-গণকে শ্রেণী অথবা শিল্প হিসাবে নহে, কার্য্যস্থান,—গ্রাম, দোকান অথবা কারখানা হিসাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র হইয়াছে কর্ম্মভূমি, কৃষকগণের সভা গ্রাম্যপঞ্চায়েতকে অবলম্বন করিয়াছে। সৈন্যগণের সভা, বিশেষ বিশেষ, রেজিমেণ্ট অথবা সৈন্যবিভাগকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রমজীবীগণের সমিতিগুলির কেন্দ্র হইয়াছে বিশেষ বিশেষ দোকান, কারখানা ও কর্ম্মস্থান।

রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের পর, হাঙ্গারী এবং জারমানীতে সোভিয়েট ঠিক এই ভাবে আপনি জাগিয়া উঠিয়াছে। পরে হয়ত নানা রাজনৈতিকদলের প্রেরণায় নূতন প্রকার ভোট দিবার প্রণালী, স্ত্রীলোকের নির্ব্বাচন, কর্ম্ম অথবা শিল্পকে ত্যাগ করিয়া পুরাতন প্রণালীর ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আসল সত্য হইতেছে এই যে নরম ও গরম দলের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে সোভিয়েট-তন্ত্র মানুষের কর্ম্মকেন্দ্রকে, তাহার শ্রমজীবনের সকল চেষ্টার অধিকারকে আশ্রয় করিয়া প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শিল্পী ও শ্রমজীবী কৃষক, দোকানী তাহাদের কর্ম্মস্থলেই স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করিয়াছে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমিতি জেলার সভায়, জেলা ও জেলার সভা প্রাদেশিক সভায় এবং প্রদেশ জাতীয় সভায় সভ্য পাঠাইয়াছে।

আর এক বিশেষত্ব এই যে এই নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও যে কোনও সময়ে শ্রমজীবিগণ প্রয়োজন বুঝিলে ফিরাইয়া আনিতে পারে। জারমাণীতে এই ব্যবস্থার অভাব-কারণে সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন ও অসন্তুষ্টি দেখা গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ইউরোপে শ্রমজীবিসংঘ সমুদায় বিশেষ বিশেষ কারখানার স্বায়ত্তশাসনের ভার লইয়া প্রজাতন্ত্রকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। রুশিয়ার সোভিয়েট শ্রমজীবীগণকে একটী প্রকাণ্ড বিভাগ লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া স্থান বিশেষে তাহাদিগকে কেন্দ্রীভূত ও একত্র করিয়াছে। এইরূপে এমন অসংখ্য সভা ও সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে যে-গুলি শুধু শিল্প ও ব্যবসায়ে নহে, সমগ্র সামাজিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

কৃষক প্রজাতন্ত্র

ভারতবর্ষ ও চীন কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্য ইউরোপে যে শ্রেণী-বিভাগ সমাজের উন্নতির সহিত জড়িত হইয়া রাষ্ট্রীয় গঠন ও

বিকাশ প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা এদেশে শোভা পায় না।—সুতরাং সেই শ্রেণী-বিভাগ যদি রাজনৈতিকদলের নাম ভাঁড়াইয়া আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে একটা স্থান খুঁজিতে চাহে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় হইবে।

কৃষক প্রজাতন্ত্রের (Peasant democracy) গঠন ও বিকাশ বিভিন্ন প্রকারে হয়। আমরা রুশিয়ার নব্য-প্রজাতন্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, তাহার গঠন ও আদর্শ কি প্রকারে পাশ্চাত্য ইউরোপের প্রজাতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষ ও চীন প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠান যদি আমাদের সমাজের গঠন ও বিকাশের ধারা অবলম্বন না করিয়া একটা নূতন আদর্শ আনিতে চাহে তাহা হইলে নূতন অনুষ্ঠানও টিকিবে না, আমাদের পুরাতন ধারাও নির্জীব হইয়া পড়িবে।

সামাজিকতা

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপন, উৎপন্ন ধনের যে তারতম্যের অভাব হেতু সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা কৃষিপ্রধান দেশের বিশেষত্ব, যে সামাজিকতা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারকে দমন করিয়া প্রত্যেক কৃষক-সমাজকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা ত আমাদের আছেই, আর আছে আমাদের হিন্দুর সেই গ্রহণ-স্পৃহা, বর্জ্জন না করিয়া সামঞ্জস্য আনয়নের আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন—এই আদর্শ হিন্দুর বর্ণধর্ম্মের সহিত উচ্চ, নীচ জাতি, অহিন্দু ও পতিত জাতির সহিত একটা মিলনের পথ খুলিয়া রাখিয়াছে, গ্রাম্য সমাজের নীরব প্রজাতন্ত্রে উচ্চ ও নীচ জাতির একটা সমভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে, হিন্দুর অধ্যাত্মজীবনে একটা ভাবুকতা ও বিশ্বজনীনতা আনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মত আরও কত লোক-ধর্ম্মের আন্দোলন অভ্যুত্থানকে সজীব রাখিয়া বর্ণধর্ম্মের বন্ধনকে অবজ্ঞা করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সামাজিকতা ও ঐক্য এবং সমূহ-ভাবের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজে, জাতি-শাসনে, শ্রেণীধর্ম্মে যে সমূহের ভাবসম্মিলন লক্ষিত হয় তাহাকে নূতন

রাষ্ট্রগঠনের উপকরণ করিয়া লইতে হইবে, যেখানে সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইয়াছে সেখানে সম্মিলন ও সমবায়ের দ্বারা বিশালতর ব্যক্তিত্বের সূচনা করিয়া, যেখানে ক্ষুদ্র গণ্ডীর নিয়ম নিষেধ মৈত্রীর অন্তরায় হইয়াছে সেখানে বৃহত্তর জীবনের নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া, যেখানে আচারের গুরুভার স্বাধীন প্রাণের সহজ বিকাশকে প্রতিরোধ করিয়াছে সেখানে আচারকে বর্জ্জন করিয়া। এসিয়ার নব্য-প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে সমূহ ও শ্রেণীর সমবায়ে। সমূহ ও শ্রেণীর সহযোগ রাষ্ট্রকর্ম্মকে যথাযথ খর্ব্ব করিয়া জন-সমাজের শাসনকুশলতাকে দৈনিক জীবনে জাগাইয়া রাখিবে। কেন্দ্রী-করণ নহে, প্রসারই নব্য-রাষ্ট্রের নীতি। আর এই প্রসারের আধার হইবে, ব্যক্তির স্বাধিকার নহে, সমূহের দায়িত্ব।

পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধিকার-স্থাপন-চেষ্টা ও সমগ্র সমাজের ঐক্যস্থাপন চেষ্টার বিরোধের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া যথেচ্ছাচার ও যথেচ্ছদমনের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। জাগিয়াছে এখন একটা সাগর-মন্থনের উন্মত্ত কোলাহল, উঠিয়াছে কত বিষম হলাহল বিষ, যাহা পান করিয়া কত দেশ অসহ্য বেদনায় কাতর। বিশ্বমানবের বিচিত্র ইতিহাসের কত ঋজু পথ বাহিয়া শেষ-নাগ এখন সাগর-বিক্ষুব্ধতরঙ্গমালার আঘাতে, দেব-মানব-দৈত্যের বিপুল প্রচেষ্টার তাড়নে পরিশ্রান্ত হইয়া এখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। প্রজা-লক্ষ্মী কালের লীলা-কমল হস্তে ধারণ করিয়া সাগর-বেলায় আসিয়া উঠিলেন, সদ্যস্নান-সিক্তবসনা। তিনি কাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবেন? ত্রিশূলপিনাকধারী শিব যে হলাহল গণ্ডূষ করিয়া তাণ্ডবনৃত্যে মাতিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বরমা প্রজা-লক্ষ্মীকে লইয়া যে বিশ্বব্যাপী প্রতি-দ্বন্দ্বিতা জাগিতেছে তাহাকে রোধ করিবেন কে? নারায়ণের উদ্বোধন কর। ভারতবর্ষ, তুমি যাঁহার স্থূল শরীর তাঁহাকে আর একবার জাগাও, তোমার মনোময় রূপটিকে আর একবার ধ্যান কর,—মঙ্গলশ্রীকে তুমিই বরণ করিতে পারিবে, অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তুমিই বিশ্বকে রক্ষা করিবে। নমো নারায়ণায়।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী ঃ—

১। বিশ্বভারত (বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী) ১ম খণ্ড
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ... ১।৹

২। ছেলেদের বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম, এ, প্রণীত ... ।৶৹

৩। অরবিন্দ (সচিত্র) ... ।৶৹

৪। চিত্তরঞ্জন (সচিত্র) শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম, এ, প্রণীত ... ... ৸৹

৫। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী ও মতামত, মহাত্মা গান্ধীর সহিত তুলনা) ... ।৹

৬। স্বদেশরেণু (৫ম সংস্করণ, স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ছড়া) ।৹

৭। পল্লীব্যথা (দুঃখময় পল্লীজীবনের করুণ কবিতা) শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত ১৲

৮। দেশের কথা (শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের দেশ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী) ... ... ৸৹

৯। কাব্যের কথা (শ্রীচিত্তরঞ্জনের বৈষ্ণব কবিতা ও বাংলার গীতি কবিতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী) ৸৹

১০। মহাত্মার বাণী (কারাদণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের প্রবন্ধাবলী) ... ... ।৹

১১। মহাত্মার বিচার ও হাকিমজীর প্রতি পত্র ৶৹

১২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন (মহাত্মা গান্ধী প্রণীত স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মূল গুজরাতী পুস্তকের অনুবাদ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম, এ,) ... ॥৹

১৩। মহাত্মার জেল কাহিনী (স্বয়ং বিবৃত) শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত ... ... ॥৹

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী :—

(সমস্ত সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসিত)

১। বন্দীর ডায়েরী—১৲ অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর ইতিহাস, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রভৃতির রোমাঞ্চকর গ্রেপ্তার কাহিনী, আলিপুর জেলের ভিতর নেতাগণের দৈনিক জীবন, ফরিদপুর জেলের লোমহর্ষণ অত্যাচার কাহিনী—এই পুস্তকে অপূর্ব্ব সরস লিখন ভঙ্গীতে উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২। স্বরাজ কোন্ পথে ?—৷৷० কো-অপারেটিভ্ নন্-কো-অপারেশন, সোসিয়ালিজম্ ও নন্-কো-অপারেশন, কংগ্রেসের পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধ আছে।

৩। উল্‌টো কথা—৷৷० ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক সরস প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ।

৪। স্পষ্ট কথা—৷৴० বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কথা।

৫। যুগশঙ্খ—৴০ যুগোপযোগী কতকগুলি উদ্দীপনাময় প্রবন্ধ।

৬। ছায়াবাজী—৷৷० সমাজের অন্ধকার দিকের চিত্র লইয়া নূতন ধরণের গল্পের বই।

৭। বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি—৷० রুশো, ম্যাট্‌সিনি, মার্কস, বাকুনিন ও টলষ্টয়ের জীবনী ও উপদেশ।

৮। স্বাধীনতার সপ্তসূর্য্য—৷৷० সানিয়াত সেন, জগলুল পাশা, কামাল পাশা, লেনিন, ডি-ভ্যালেরা, গ্রিফিথ্‌স্ ও কলিন্সের চিত্র, জীবনী ও কার্য্যপ্রণালী—৷৷०।

৯। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস— (যন্ত্রস্থ)

10. The Intellectual Laws of Language and the Science of Meaning-change (Thesis for P. R. S.) (In the Press)

11. The Revolutionaries of Bengal : their methods and ideals. Re. 1/-